ফ্রয়েড
ও
মনঃসমীক্ষণ

(Dr. Clifford Allen প্রণীত 'Modern Discoveries in Medical Psychology' গ্রন্থের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ)

শ্রীসুনীলচন্দ্র বিশী, এম্,এস্-সি
মনোবিদ্যা বিভাগ (ব্যবহারিক শাখা), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
শ্রীঅসিত কুমার রায়, বি, এস্-সি
অনূদিত



শ্রীশিশির কুমার আচার্য্য চৌধুরী
সংস্কৃতি বৈঠক
১৭ পণ্ডিতিয়া প্লেস, বালিগঞ্জ,
প্রকাশিত।

চিত্রশিল্পী:
ব্লক—শ্রীহৃষীকেশ সেনগুপ্ত
প্রচ্ছদপট—শ্রীঅসিত রায়

প্রথম প্রকাশ
১ বৈশাখ ১৩৫৩।

মূল্য দেড় টাকা।

সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন জটিল হতে জটিলতর হয়ে চলেছে। মানুষের পরমাত্মীয় তার নিজের মন অথচ তার যথার্থ পরিচয় তার কাছে বেশীর ভাগ অজানাই রয়ে যায়। দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলতে গেলে নিজের মনের একটু নিবিড় পরিচয় থাকলে সুবিধা হয়—অন্যের মনকে জানার পক্ষেও তা অনেকটা সাহায্য করে।

মনোবিদ্যাজগতে ফ্রয়েডের দান অতুলনীয়। সংস্কারমুক্ত হয়ে তাঁর তথ্যগুলি আলোচনা করলে সেগুলি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করা সকলের পক্ষেই সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি। সংস্কারমুক্ত বিচারবুদ্ধি আমাদের জ্ঞানলাভের সহায়তা করে। ফ্রয়েড সম্বন্ধে প্রিয় ও অপ্রিয় অনেক সমালোচনাই হয়ে গেছে। বাঙালী পাঠক-পাঠিকা ফ্রয়েডের বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি জেনে যাতে উপকৃত হতে পারেন, এই উদ্দেশ্যেই আমাদের এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়াস।

ডক্টর ক্লিফোর্ড এ্যালেন, এম, ডি ; এফ, আর, সি, পি ; ডি, পি, এম তাঁর গ্রন্থের এই অংশকে আমাদের অনুবাদ করার অনুমতি দিয়ে সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। ঐ গ্রন্থের প্রকাশক ম্যাক্‌মিলান য়্যাণ্ড কোম্পানি লিমিটেড এই অনুমতি সংগ্রহে সহায়তা করেছেন—তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক ডক্টর সুহৃৎচন্দ্র মিত্র, ডি, ফিল (লাইপজিগ) ; এফ, এন, আই মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখে ও সমস্ত পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়ে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য

করেছেন—তাঁকে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। 'লুম্বিনি কাননের' মানসিক রোগের চিকিৎসক ডাঃ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম, এস-সি; এম, বি, বি, এস মহাশয়ের নিকট থেকেও আমরা সহায়তা পেয়েছি—তাঁকে আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শ্রীশিশিরকুমার আচার্য চৌধুরী, বি, এ মহাশয়ের উৎসাহ ছাড়া এ পুস্তক প্রকাশ সম্ভব হত না।

অনুবাদকদ্বয়

ভূমিকা

মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে আজ আমাদের দেশেও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে, সেটা খুবই সুখের বিষয়। কারণ এর তথ্যগুলি যথাযথভাবে আলোচিত হলে এবং কার্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে সমাজের যে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। পরিবারবর্গ নিয়েই সমাজ; সুতরাং সমাজের ভাল মন্দ, উন্নতি অবনতি অবশেষে পরিবারের ভাল মন্দ, উন্নতি অবনতির ওপরই নির্ভর করে। পরিবারভুক্ত প্রত্যেক লোকের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য, পরস্পরের প্রতি মনোভাব এবং ব্যবহার যত উন্নত হবে সমাজও তত কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে থাকবে। শারীরিক স্বাস্থ্যের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আগেই আকৃষ্ট হয়েছে। প্রত্যেক লোকের, পল্লীর, সহরের স্বাস্থ্য কি করে ভাল করা যায়, সংক্রামক রোগের হাত থেকে কি করে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, এসব দিকে চেষ্টাও কিছু কিছু হচ্ছে। যদিও যা হওয়া প্রয়োজন তার তুলনায় কিছুই হয় নি। কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে দেখাও যে একান্তই দরকার সেটাও সকলে হৃদয়ঙ্গম না করলেও যাঁদের বাড়ীতে মনসিক রোগগ্রস্ত কেউ আছেন তাঁরা মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করেন। মানসিক রোগীর সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে। মনঃসমীক্ষণ অনেক মানসিক রোগের চিকিৎসার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। উপরন্তু যে সত্যগুলি মনঃসমীক্ষণের সাহায্যে আবিষ্কৃত হয়েছে, শিশুদের শিক্ষার কাজে সেগুলি ব্যবহার করলে অনেক ভবিষ্যৎ মানসিক রোগ নিবারিত হতে পারে। মানসিক রোগ ব্যতীত আরও অনেক বিষয়েই মনঃসমীক্ষণ একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এনে দিয়েছে, নতুন জ্ঞান দিয়েছে। সুতরাং তথ্য এবং অনুশীলন দুয়ের দিক দিয়েই মনঃসমীক্ষণের যথেষ্ট প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মাতৃভাষার সাহায্য ভিন্ন কোন জ্ঞানেরই বহুলপ্রচার সম্ভব নয়, একথা স্বতঃসিদ্ধ। তাই বাংলা ভাষায় এ সম্বন্ধে পুস্তকাদি রচিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। ইংরাজীতে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের লেখা অনেক ভাল বই আছে। এ গুলি আমাদের ভাষায় অনূদিত হলে শুধু আমাদের সাহিত্যই সমৃদ্ধিশালী হবে না, সমাজের উপকারও যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। তাই আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান্ সুনীল বিশী যখন Dr. Clifford Allen এর Modern Discoveries in Medical Psychology অনুবাদ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করে আমার পরামর্শ চেয়েছিলেন তখন আমি আগ্রহের সঙ্গে তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করেছিলাম। তিনি আর তাঁর বন্ধু শ্রীমান্ অসিতকুমার রায় দুজনে মিলে অনেক পরিশ্রম করে বইখানির দুটো অধ্যায়ের অনুবাদ শেষ করেছেন এবং সকলের কাছে আজ প্রকাশ করছেন। যে রকম সহজ সরল ভাষা তাঁরা বরাবর ব্যবহার করেছেন তাতে এই অত্যন্ত জটিল বিষয়টি বোঝা কারও শক্ত হবে না বলেই মনে করি।

পরিশেষে একটি কথা বলি। মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার অন্ত নেই। এমন গভীর ঘনিষ্ঠ ব্যাপার মনঃসমীক্ষণের বিষয়বস্তু যে এ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা ব্যক্তির ও সমাজের উভয়েরই ক্ষতিকর। সে দিক থেকে বিচার করলে আমার মনে হয় শ্রীমান্দ্বয় এই অনুবাদ করে সকলের উপকারই করেছেন। আশা করি যাঁদের জন্য এই অনুবাদ প্রকাশ করেছেন তাঁরা সত্যই উপকৃত হবেন। আমি এঁদের অনুরোধ করি তাঁরা যেন ভবিষ্যতে এই জাতীয় অন্যান্য পুস্তকের অনুবাদের ভার নেন।

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু



জন্ম : ১৮৫৬] ডাঃ সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড [মৃত্যু : ১৯৩৯

এক

মনঃসমীক্ষণ ফ্রয়েডের নিজস্ব আবিষ্কার। মর্টন প্রিন্স (Morton-Prince) ও পিয়েরে জ্যানে (Pierre Janet) ফ্রয়েডের কাজের গোড়া পত্তন ও অনেক সুবিধা করে গিয়েছেন বটে, তবে একথা বলা চলেনা যে তাঁরা না থাকলে মনঃসমীক্ষণ আবিষ্কার হত না। মনঃসমীক্ষণ আন্দোলনের (Psycho-analytic Movement) ইতিহাসের এক স্থানে তিনি লিখে গিয়েছেন—"মনঃসমীক্ষণ আমার নিজস্ব আবিষ্কার; দশ বছর ধরে আমি একাই এ কাজে ব্যাপৃত ছিলাম এবং এই মনঃসমীক্ষণের জন্য আমার সমসাময়িকেরা সকলেই বিরক্ত হয়ে আমার প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করেছেন।"

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে মোরাভিয়ার অন্তর্গত ফ্রিবুর্গ সহরে ফ্রয়েড জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামাতা ছিলেন ইহুদী। তিনি বড় হয়ে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে যান। স্নাতক (graduate) হওয়ার আগেই আর্ণষ্ট্ ব্রুকের (Ernst Brucke) অধীনে একজন demonstrator-এর পদলাভ করেন। ব্রুক্ ছিলেন শারীর-বৃত্তের (physiology) অধ্যাপক। তিনি নিজে যেমন সুষ্ঠু

ও প্রণালীশুদ্ধ ভাবে কাজ করতেন, ফ্রয়েডকেও যত্নের সঙ্গে সেইভাবে কাজ করতে শেখান।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রয়েড একটি সাধারণ হাসপাতালে সহকারী চিকিৎসক নিযুক্ত হলেন। এখানে তিনি কোকেনের দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে পরীক্ষা করতে থাকেন ও এ সম্বন্ধে একটি বিবরণী লেখেন। তিনি গবেষণা করে দেখলেন যে যদি জিহ্বা বা শ্লেষ্ম-ঝিল্লির (mucous membrane) ওপর কোকেন লাগান হয়, তবে সেগুলিকে অসাড় করে দেওয়া যেতে পারে। এই বিবরণীটি একজন চক্ষু চিকিৎসক পাঠ করেন এবং ইনি চোখে অস্ত্রোপচার করবার জন্য কোকেন ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। ফ্রয়েডের বিপক্ষবাদীদের খুব কম লোকেই জানেন যে তাঁর প্রথম আবিষ্কারই চক্ষু চিকিৎসা জগতে একটি নূতন যুগের সৃষ্টি করেছিল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রয়েড প্যারী (Paris) সহরে সারকোর (Charcot) নিকট অধ্যয়ন করতে গেলেন। সারকো ছিলেন তখনকার দিনে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্নায়ু বিশেষজ্ঞ। এখানে ফ্রয়েড রোগ-বিজ্ঞার কাজে (Pathologist) নিযুক্ত ছিলেন। এখনও যে-সব চিকিৎসক জন্মকালীন আঘাতের দরুণ মস্তিষ্কের ক্ষতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তাঁদেরও এ বিষয়ে ফ্রয়েডের লিখিত গ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়।

সারকোর সঙ্গে কাজ করার সময় ফ্রয়েড সারকোর একটি পরীক্ষা দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এই পরীক্ষাতে সারকো একটি রোগীকে সংবিষ্ট (hypnotised) করে হিস্টিরিয়ার সমস্ত লক্ষণ ফুটিয়ে তুললেন। এ দেখে ফ্রয়েড খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলেন কারণ তখন পর্যন্ত জার্মান ও অষ্ট্রিয়ান চিকিৎসকদের ধারণা ছিল যে স্নায়ু-মণ্ডলীতে যান্ত্রিক পরিবর্তন হওয়ার দরুণই হিস্টিরিয়া হয়। এই বিশ্বাস

যে কেবল বৈদেশিক স্নায়ু-বিশেষজ্ঞদেরই ছিল তা নয়, লণ্ডনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্নায়ু চিকিৎসাগারে এখন পর্যন্ত এই শিক্ষাই দেওয়া হয়।

ভিয়েনাতে ফিরে আসার পর ফ্রয়েড সংবিষ্ট করে হিস্টিরিয়ার লক্ষণগুলি প্রকাশ করানো ছাড়া, পুরুষের মধ্যেও যে হিস্টিরিয়া রোগ দেখা যায় তার প্রমাণও পেলেন ও সে কথা প্রচার করলেন। এতে সকলেই তাঁকে উপহাস করতে লাগল এবং তাঁকে অনুরোধ করা হল যে তাঁর এরূপ মূর্খতা প্রকাশ না করাই ভাল।

জোসেফ ব্রয়ার (Joseph Breuer) নামে একজন বড় চিকিৎসকের সঙ্গে ফ্রয়েড কাজ করতে লাগলেন। ব্রয়ার আবিষ্কার করেছিলেন যে রোগীদের সংবিষ্ট করে তাদের হারানো স্মৃতি পুনরুদ্ধার করা যায় এবং এই স্মৃতিগুলি পুনরুদ্ধার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিস্টিরিয়ার লক্ষণগুলি সব চলে যায়। ১৮৯৩ ও ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তাঁরা দু'জনে এসব কাজের একটা ফিরিস্তি দিলেন। তাঁরা এই মতই ব্যক্ত করলেন যে হারানো স্মৃতি উদ্ধার করতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভগুলিও (emotions) দূর হয়ে যায়। এই ব্যাপারটিকে তাঁরা বিরেচন (cathersis) নামে অভিহিত করলেন। এই উপায়ে চিকিৎসায় রোগের কারণ-মূলক প্রক্ষোভ বার করে দেওয়া হয়। এই প্রক্ষোভ বা'র করে দেওয়াকে তাঁরা অভিস্ফোট (abreaction) নামে অভিহিত করলেন।

এই প্রণালীটি সারকোর চিকিৎসা-প্রণালার ঠিক্ বিপরীত। সারকো "ধারণাগুলিকে" অনুপ্রবেশিত করে দিয়ে হিস্টিরিয়ার লক্ষণগুলি প্রকাশ করাতেন কিন্তু ফ্রয়েড ধারণাগুলিকে টেনে বার করে লক্ষণগুলি দূর করতেন।

ফ্রয়েড আবার ফ্রান্সে গেলেন কিন্তু এবার ন্যান্সী (Nancy)-তে

বার্ণহাইমের (Bernheim) কাছে অধ্যয়ন করতে। বার্ণহাইমের একটি পরীক্ষামূলক কার্য দেখে তিনি খুবই অভিভূত হলেন। বার্ণহাইম একটি রোগীকে সংবিষ্ট করে তাকে নিদ্রান্ত-অভিভাবন (suggestion) দিয়ে বলতেন—"যখন বারোটা বাজবে তখন তুমি জানালাটি খুলবে।" এরপর রোগীটিকে জাগিয়ে দেওয়া হত। সত্যিই যখন ঘড়িতে বারোটা বাজত তখন রোগীটি জানালা খুলে দিত। কেন সে একাজ করেছে একথা বার্ণহাইম তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলতনা যে, 'আপনি আমাকে একাজ করতে বলেছিলেন' বা 'এটা করতে আমার খুব ইচ্ছা হয়েছিল'। কি যে উত্তর দেবে এ নিয়ে সে হাতড়ে বেড়াত এবং শেষ পর্যন্ত যা বলত সেটা তার নিজের বিসদৃশ কাজের সমর্থনের জন্য মনগড়া কথা। যেমন ধরুন, সে বলতে পারে, 'খুব গরম লাগছিল বলেই জানলা খুলে দিয়েছি।'

বার্ণহাইম কিন্তু এসব উত্তরে সন্তুষ্ট হতেন না। রোগী সত্যি কেন একাজ করেছে একথা বলাবার জন্য তাকে পীড়াপীড়ি করতেন। এইরূপ খুব খানিকটা পীড়াপীড়ি করবার ফলে তার একাজ করার প্রকৃত কারণ স্মৃতিপথে আসত। এইভাবে বার্ণহাইম সংজ্ঞান (conscious) মনের সঙ্গে নির্জ্ঞান (unconscious) মনের যোগসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম হতেন। শেষ পর্যন্ত রোগী বলতে সক্ষম হত যে, 'আপনিই ত জানলা খুলতে বলেছিলেন—তাইত আমি খুলেছি। আমার এখন বেশ মনে হচ্ছে যে আপনি আমাকে বলেছিলেন, বারোটা বাজলে জানলা খুলতে হবে।'

ফ্রয়েড এখন এই ব্যাপারের মূল সূত্রের সন্ধান পেলেন। তিনি বুঝলেন যে রোগীর নিজের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা চলে না কারণ রোগী নিজেই জানে না যে তার রোগের লক্ষণগুলি কেন হয়েছে—।

ফ্রয়েড জানতেন যে রোগীর রোগের প্রকৃত কারণ তার নির্জ্ঞান মনের গভীর স্তরে আবদ্ধ থাকে। কি করে এই 'কারণ'-কে বিস্মৃতি থেকে স্মৃতি-পথে আনা যায় তাও তিনি জানতেন। রোগীকে ক্রমাগত পীড়াপীড়ি করে তার স্মৃতি-বিস্মৃতির মাঝের পর্দাটিকে তুলে ফেলা যেতে পারে।

ফ্রয়েড যখন হিস্টিরিয়া রোগীদের চিকিৎসার নূতন প্রণালী প্রয়োগ করতে লাগলেন তখন দেখলেন যে অনেক ক্ষেত্রে তিনি অকৃতকার্য হচ্ছেন। তিনি রোগীদের কপালের ওপর হাত রেখে দেখতেন যে অনেক সময় রোগীর কোন ঘটনা মনে পড়ে গিয়েছে। কিন্তু এটা সংবেশনের (hypnosis) রূপান্তর মনে করে শীঘ্রই এরূপ করা বন্ধ করে দিলেন। এখন তিনি ধারণা করলেন যে রোগীকে তার নিজের খুসী মত যা মনে আসে তাই বলতে বলাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এইটাকেই তিনি অবাধ ভাবানুষঙ্গ (free association) বললেন। এখনও পর্যন্ত এইরূপ প্রণালীতে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। "রোগীকে আরাম কেদারায় শুইয়ে দেওয়া হয় এবং চিকিৎসক ঠিক্ তার মাথার কাছে বসেন। রোগীকে যা-ইচ্ছা তাই অনর্গল বলতে বলা হয়।" এইরূপে শীঘ্রই দেখা যায় যে সময় কমই লাগুক বা বেশীই লাগুক—শেষ পর্যন্ত তার এমন অনেক ঘটনা মনে পড়ে যেগুলি তার মনের গভীর স্তরে সুপ্ত ছিল—এতদিন যে সব ঘটনা তার মনের অগোচরে ছিল এখন সে সব তার মনে পড়তে লাগল। ফ্রয়েড দেখলেন যে এইভাবে কথা বলার সময় রোগী যে সব কথা চাপতে সব চেয়ে বেশী সচেষ্ট হয় সেইগুলি তার রোগের প্রধান কারণ। এখন দেখা যাক যে ফ্রয়েড নূতন কি আবিষ্কার করলেন। জ্যানে ও মর্টন প্রিন্স দেখিয়েছেন যে মানুষের চেতনা খণ্ডিত ও অসংলগ্ন হওয়া সম্ভব। এইসকল খণ্ডিত

অংশগুলি প্রধান সংজ্ঞান মনের ধারার সঙ্গে মিশতে পারেনা এবং ফলে এই দাঁড়ায় যে রোগীর কোন বিশেষ ঘটনা মনে পড়লে সেই ঘটনার আনুষঙ্গিক প্রক্ষোভও সে অনুভব করে। [ইয়ুঙ্ (Jung) এই সব খণ্ডিত চেতনাকে গূঢ়ৈষা (complex) নামে অভিহিত করেছেন ।]

এ পর্যন্ত আমরা দেখলাম যে ফ্রয়েড যে সমস্ত কাজ করেছেন সেগুলি সব জ্যানের কাজের ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত। জ্যানে মনে করতেন যে গূঢ়ৈষাগুলি মানসিক পীড়নের (tension) জন্য প্রধান চেতনা হতে খণ্ডিত হয়ে যায়। ফ্রয়েড কিন্তু ভাবলেন যে গূঢ়ৈষাগুলি তাদের সঙ্গে খুব যন্ত্রনাদায়ক প্রক্ষোভ বহন করে বলেই সেগুলিকে সংজ্ঞান মন থেকে দাবিয়ে দেওয়া হয়। মন অতি দুর্বলভাবে গঠিত হলেও খণ্ড-বিখণ্ড হয় না, বরং প্রবল শক্তির চাপেই বিভক্ত হয়।

যে শক্তি সাধারণ ভাবে বা অবাধ-ভাবানুষঙ্গ করবার সময় রোগীকে কোন একটা জিনিষ স্মৃতিপথে আনতে প্রবল বাধা দিচ্ছে তাকেই ফ্রয়েড বলেছেন "প্রতিবন্ধ" (resistance)। যে প্রণালীতে কোন ধারণা সংজ্ঞান মন থেকে নিম্ন-স্তরে চলে যায়, তাকে তিনি বলেছেন অবদমন (repression)। ফ্রয়েডের এই সমস্ত কথাগুলি আজকাল অনেকের মুখে ভুলভাবে ব্যবহার করতে শোনা যায় কারণ তাঁরা এই সব কথার উৎপত্তির গোড়ার ব্যাপারটাই জানেন না। অনেকের মুখেই হীনতাভাব (inferiority complex) কথাটির ব্যবহার শুনতে পাওয়া যায়। তাঁরা বলেন, "লোকটি হীনতা-ভাব-এ ভুগছে"। এইসব লোকে এইটাই বোঝাতে চান যে—"ব্যক্তিটির কোন একটি গূঢ়ৈষা থাকার জন্য সে নিজেকে হীন মনে করে"। যে গূঢ়ৈষাটি এই হীন-মনোভাবের কারণ তা সম্ভবতঃ সেই ব্যক্তিটির জানা সম্ভব নয়। যেহেতু যে মুহূর্তে এই গূঢ়ৈষাটি ব্যক্তিটির সংজ্ঞান মনে এসে উপস্থিত হয়, তখনই তার এই

হীন-মনোভাব চলে যায়। গূঢ়ৈষা সর্বদাই মনের নির্জ্ঞান স্তরে থাকে —এটা সংজ্ঞান মনে রাখা সম্ভব নয়। 'অবদমন' কথাটিও অনেক সময় ভুল অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কোন ঘটনাকে ইচ্ছাপূর্বক সংজ্ঞান মন থেকে জোর করে দাবিয়ে দেওয়াকে "অবদমন"বলে মনে করা হয়। অনেকেই বলে থাকেন যে অনেক চেষ্টা করেও 'এই জিনিষটাকে মন থেকে অবদমন করতে পারছেন না। কিন্তু এটা একেবারে অসম্ভব, কারণ অবদমন একটা নির্জ্ঞাত প্রণালী। কোন ব্যক্তি কোন ঘটনা অবদমন করছে কিনা, সেটা জানা তার পক্ষে সম্ভব নয়। "প্রতিবন্ধ" কথাটির বেলাও ঠিক্ এই কথাই বলা যেতে পারে, কারণ যখনই কেহ জানতে পারে যে কোন একটা কথা বলতে সে বাধা পাচ্ছে, তখনই সে বাধা ধীরে ধীরে মন থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে থাকে। ফ্রয়েড তাঁর রোগীদের মধ্যে দেখেছেন যে যখন রোগীরা বিশেষ কোন ব্যাপার প্রকাশ করছেনা তখন যে তারা ইচ্ছা করে এটা করছে তা নয়; প্রকৃত পক্ষে ভিতর থেকে তারা যে একটি প্রবল বাধা পাচ্ছে, সে কথা তারা জানেনা।

ফ্রয়েডের চিকিৎসার ধারা অনেকটা শত্রুপক্ষের দেশে গুপ্তচরের কাজের মত। রোগীর মনের গোপন খবর নিতে তিনি যত রকম বাধা তা পেতেন। অবাধ-ভাবানুষঙ্গের সময় রোগীর কাছ থেকে যে সব খুঁটি-নাটি সংবাদ প্রকাশ পেয়ে যেত সেগুলি একসঙ্গে জোড়া দিয়ে তিনি রোগীর মনের অনেক খবর পেতেন। ফ্রয়েড আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করলেন যে রোগীকে কিছুকাল অবাধ-ভাবানুষঙ্গ করবার পর তার চিকিৎসকের অর্থাৎ ফ্রয়েডের প্রতি প্রক্ষোভের সঞ্চার হত। সমীক্ষকের প্রতি রোগীর হয় ভালবাসা নয় ঘৃণা জন্মে। রোগী যে প্রত্যক্ষ ভাবে চিকিৎসকের প্রতি তার ভালবাসা কিম্বা ঘৃণা প্রকাশ করে তা নয়, তার

আচার-ব্যবহার ভাব-ভঙ্গীতেই চিকিৎসকের প্রতি তার প্রক্ষোভ প্রকাশ পেয়ে যায়। মনে করুন যদি কোন রোগী সমীক্ষকের প্রতি ভালবাসা পোষণ করতে আরম্ভ করে, তখন দেখা যায় যে রোগী যাওয়ার সময় তার দস্তানা বা ছাতা সমীক্ষকের ঘর থেকে নিয়ে যেতে হয়ত ভুলে গেছে। তার মানেই তার ফিরে আসবার একটা প্রবল ইচ্ছা আছে। কিম্বা হয়ত দেখা যায় যে রোগী আগ্রহের সঙ্গে তার চিকিৎসক ও তাঁর পরিবারবর্গের কুশল জিজ্ঞাসা করে। লেখকের জানা একটি রোগী তার চিকিৎসকের কন্যার মত পোষাক-পরিচ্ছদ পরা আরম্ভ করেছিল। এক্ষেত্রে রোগীর চিকিৎসকের অন্যান্য রোগীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়াও মোটেই আশ্চর্যজনক ঘটনা নয়। চিকিৎসক—যিনি রোগীর আরোগ্যের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন, তাঁর প্রতি যে রোগীর শ্রদ্ধা বা ভালবাসা জন্মাবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তবে এইটাই আশ্চর্য যে অনেক রোগী চিকিৎসকের প্রতি বিদ্বেষভাবও পোষণ করে। চিকিৎসকের প্রতি এই যে ঘৃণা এটা কিন্তু তারা সামনা-সামনি কথা-বার্তার দ্বারা প্রকাশ করত না—পরোক্ষভাবে তাদের বিদ্বেষ প্রকাশ পেত। হয়ত তারা অন্য চিকিৎসকের প্রশংসা করত বা সমীক্ষককে চিকিৎসার টাকা দিতে ভুলে যেত। অনেক সময় তারা সমীক্ষকের নামে কুৎসা রটনা করতেও দ্বিধা বোধ করত না। মোটকথা, এইসব কথাবার্তা কাজ-কর্মের মধ্যে দিয়ে সমীক্ষকের প্রতি তাদের ঘৃণা প্রকাশ পেয়ে যেত।

ফ্রয়েড এই সব থেকে একটা আশ্চর্যজনক তথ্য আবিষ্কার করলেন। তিনি দেখলেন যে সমীক্ষকের প্রতি রোগীর এই যে ব্যবহার (ভালবাসা বা ঘৃণা) এটা যেন কোন বিশেষ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে করছে—যাকে সে অতীতে ভালবাসত বা ঘৃণা করত। পিতা-মাতার প্রতি যে ব্যবহার করা হয়, ফ্রয়েড রোগীদের কাছ থেকেও সাধারণতঃ সেইরূপ

ব্যবহার পেতেন। ফ্রয়েড দেখলেন যে তাঁর প্রতি রোগীর যে প্রক্ষোভ সেটা রোগীর নিজের পিতা-মাতার, ভাই-বোনদের অথবা অন্য কারও প্রতি প্রক্ষোভের রূপান্তর মাত্র। এই রূপান্তরকে ফ্রয়েড নাম দিয়েছেন "সংক্রমণ" (transference)। এই সংক্রমণের কথা বাইরে প্রকাশ করবার পর কতকগুলি লোক তাঁকে দুর্নীতি-পরায়ণ বলে মনে করত। তারা জানত না যে সংক্রমণও একটা মানসিক অভিব্যক্তি। একটি সুন্দরী মহিলা তাঁর সমীক্ষককে যদি ভালেবেসে ফেলেন, এটা সমীক্ষক জানতে পেলে মোটেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন না কারণ সমীক্ষক জানেন যে রোগীর এ ভালবাসা তাঁর সমীক্ষকের প্রতি নয়, এটা অন্য কারও প্রতি (পিতার প্রতিও হতে পারে—যাকে তিনি ছেলেবেলায় ভালবাসতেন)। সেইরকম সমীক্ষকের প্রতি রোগীর ঘৃণার ভাব দেখে সমীক্ষক অপমান বোধ করেন না, কারণ তিনি জানেন যে এই ঘৃণাটা প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রতি নয়—হয়ত আসলে এটা তাঁর পিতা-মাতার প্রতি। চিকিৎসার অগ্রগতির জন্য সংক্রমণ জিনিষটির খুবই দরকার, কারণ এর সাহায্যে রোগীর নির্জ্ঞান মনে পৌঁছান সুবিধা হয়, তবে এটা নিয়ন্ত্রণ করতে জানা চাই। ভালবাসা বা ঘৃণার উৎস কোথায় সেটা রোগীকে জানিয়ে দেওয়া সমীক্ষকের একান্ত কর্তব্য। সমীক্ষকের প্রতি রোগীর ভালবাসা যদি গভীর হয়ে ওঠে তবে সমীক্ষণ আর বেশীদূর এগোনো সম্ভব নয়। সমীক্ষকের প্রতি যদি রোগীর ঘৃণা গভীর হয়, তবে হয়ত রোগী শেষ পর্যন্ত সমীক্ষকের ওপর খড়্গহস্ত হতেও দ্বিধা বোধ করে না।

এখন দেখা যাক যে চিকিৎসকমণ্ডলী ফ্রয়েডের আবিষ্কারগুলিকে কি চোখে দেখলেন। ফ্রয়েড কোনরূপ অসন্তোষ প্রকাশ না করে তাঁর বইয়ের একজায়গায় লিখেছেন—"তখনকার চিকিৎসা সাহিত্যে আমার লেখার কোনরূপ সমালোচনা করা হত না। যদি বা কখনও কোন

সমালোচনা বেরোত, তবে তাতে আমার বিরুদ্ধেই সব কিছু বলা হত। আমার সহকর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের লেখাতে আমাকে "সামঞ্জস্যহীন", "চরম-পন্থী" বা "অশ্লীল" এইসব আখ্যাতে অভিহিত করতেন।" ফ্রয়েড বলেছেন যে অনেক সময় তাঁর বই না পড়েই সমালোচনা করা হত; এমন কি যাঁদের তাঁর বই সত্যিই ভাল লেগেছিল (যাঁরা এই আবিষ্কারগুলির মূল কথা অনুমোদন করেছিলেন) তাঁদেরও স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করবার সাহস ও সামর্থ্য ছিল না।

ফ্রয়েড দেখেছিলেন যে তাঁর রোগীরা তাঁকে যে সমস্ত স্বপ্নের কথা বলত সেগুলি থেকে রোগীদের 'যৌন-প্রকৃতি' উদ্ঘাটিত হত। এইসব জিনিষকে অশ্লীল মনে করার দরুন ব্রয়ার ফ্রয়েডের সঙ্গ ত্যাগ করলেন। এইসব স্বপ্ন ব্যাখ্যা করবার জন্য ফ্রয়েড কতকগুলি সূত্রের সমাধান পেলেন। ফ্রয়েড দেখলেন যে জাগর-স্বপ্নগুলি (day-dreams) যেমন সর্বদাই ইচ্ছার পরিপূরক, স্বপ্নও সেইরূপ ইচ্ছার পরিপূরক; তবে তফাৎ এই যে স্বপ্নের ইচ্ছাগুলি লুক্কাইত অবস্থায় থাকে। স্বপ্নের প্রকৃত অর্থের চেয়ে তার প্রকার ভঙ্গীর বিভিন্নতা তিনি বুঝতে পারলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন এরকম কেন হয় এবং অবশেষে এর সমাধান পেলেন।

ফ্রয়েড দেখলেন যে রোগীদের স্বপ্নের বর্ণনা তাদের স্বপ্নের প্রকৃত অর্থের বাহ্যরূপমাত্র—এর সত্যিকারের অর্থ তাদের মনের গভীর স্তরে লুক্কাইত আছে। এই স্বপ্ন-বর্ণনার বাহ্যরূপকে তিনি নাম দিলেন "ব্যক্ত অংশ" (manifest content) এবং এর লুক্কাইত প্রকৃত অংশের নাম দিলেন—"অব্যক্ত অংশ" (latent content)। এই বিকৃতির (distortion) কাজকে তিনি নাম দিলেন "স্বপ্ন ক্রিয়া" (dream-

work)। অনেক লোকে বলে থাকেন —"আমার স্বপ্নের প্রকৃত কারণ আমি জানি। আমার দিনের বেলার কাজকর্ম সম্বন্ধে সব ব্যাপার স্বপ্নে প্রকাশিত হচ্ছে।" এই সকল লোকে ব্যক্ত-অংশের ওপর নির্ভর করেই তাঁদের স্বপ্নের ব্যাখা করে থাকেন। সুতরাং স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ তাঁদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যায়। পূর্বদিনের ঘটনাবলী যে স্বপ্ন তৈরী হতে সাহায্য করে, একথা ফ্রয়েড স্বীকার করেন এবং এটাকে তিনি পূর্ব দিনের "অবশিষ্টাংশ" (residue) আখ্যা দিয়েছেন। এই-টাই প্রথমে জানতে হবে যে কি করে স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ বিকৃত হয়। ফ্রয়েড দেখলেন যে এ বিকৃতির জন্য মন অনেক কৌশল অবলম্বন করতে পারে। প্রথমেই বলা যেতে পারে—"সংক্ষেপনের" (condensation) কথা। এতে স্বপ্নের উৎপত্তির কারণ সমূহের অঙ্গগুলি একত্রীভূত হয়ে যায়, সুতরাং স্বপ্নের একটি বাহ্যিক ঘটনা অনেকগুলি ঘটনার সমষ্টি হতে পারে। যেমন বলা চলতে পারে যে একটি মুখে দু'জন বিভিন্ন লোকের মুখ প্রকাশ পেতে পারে। "অভিক্রান্তির" (displacement) ধারা আরও অদ্ভুত। স্বপ্নে যে ঘটনার সঙ্গে প্রক্ষোভ জড়িত থাকা উচিত ছিল, সেখানে না থেকে অন্য ঘটনার সঙ্গে জড়িত হয়ে প্রকাশ পেলে তাকে বলা হয় "অভিক্রান্তি"। প্রতীক-পরিণতি (symbolisation) বিকৃতির আর একটি উপায়। সমস্ত স্বপ্নেই প্রতীক পাওয়া যায়। কারণ স্বপ্নে প্রকাশ ভঙ্গীটা অনেকটা রাজনৈতিক ব্যঙ্গ-চিত্রের মত। ব্যঙ্গ-চিত্রকরেরা বল্ড্‌ইনের (Baldwin) শান্তি-প্রিয়তা বোঝাতে যখন গরুর দেহের ওপর বল্ড্‌ইনের মাথা আঁকতেন, তখন তাঁরা অনেকটা স্বপ্ন-কৌশলের সাহায্য নিতেন। ব্যঙ্গ-চিত্রে ব্রিটেনের পরিবর্তে 'বুল্-ডগ্' এবং ফ্রান্সের পরিবর্তে ছোট লোমশ কুকুর আঁকা হয়ে থাকে। যদি কোন

লোকের ব্যবহার শূকরের মত হয় তবে স্বপ্নে লোকটিকে শূকরের মূর্তিতে দেখা যেতে পারে।

এইরূপে স্বপ্ন-বিকৃতির প্রকৃত তথ্যগুলি জেনে নিয়ে আমাদের "গৌণ-বিস্তারের" (secondary elaboration) কথা জানতে হবে। স্বপ্নে বিকৃত অংশগুলি নিয়ে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনা তৈরী করাকে বলে 'গৌণ-বিস্তার'। এই সব নানারকম বিকৃতি একসঙ্গে হওয়ার দরুণ স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ আবিষ্কার করা বড়ই কঠিন।

যে শক্তি স্বপ্নের অর্থকে বিকৃত করে, ফ্রয়েড তাকে বলেছেন—"স্বপ্ন-প্রহরী" (dream-censor)। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে প্রতিবন্ধ ও অবদমন-প্রণালী আলোচনা করবার সময় আমরা যে শক্তির আলোচনা করেছিলাম, এটা সেই শক্তিরই একটি ভিন্নরূপ। অনেকে নির্বোধের মত মনের প্রহরীকে একটি মানসিক বৃত্তি বলে মনে করে থাকেন—তাঁরা ভাবেন যে এই বৃত্তি স্বপ্নের ভাবধারা চালিত করে, কিন্তু এটা জানেন না যে "মনের প্রহরী" একটি শক্তি ছাড়া কিছুই নয়। স্বপ্ন কেন যে বিকৃত হয়ে প্রকাশ পায়, এটা অনেকেই জিজ্ঞাসা করতে পারেন; অবিকৃত অবস্থায় প্রকাশ না পাওয়ার কারণ কী থাকতে পারে ?—এ প্রশ্নের সমাধান করা খুবই সহজ। কারণ ফ্রয়েডই আবিষ্কার করেছেন যে যে-সব ইচ্ছা স্বপ্নে পূরণ হতে চায় সেগুলি সবই যৌন-সম্বন্ধীয় বা কামনামূলক। অবদমনকারী শক্তি (repressive force) খুব প্রবল থাকে বলে স্বপ্ন-দর্শক স্বপ্নের সম্পূর্ণ অর্থ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় না। সেইজন্য ফ্রয়েড দেখলেন যে স্বপ্নকে বিভিন্ন ঘটনায় বা অংশে ভাগ করে নেওয়া উচিত। এখন এই প্রত্যেকটি অংশের সঙ্গে স্বপ্নদর্শকের সহিত অবাধ-ভাবানুষঙ্গ করা হয়। এইরূপে স্বপ্নের বিভিন্ন অংশের সহিত ভাবানু-

ষঙ্গ করবার পর প্রকৃত অর্থগুলি জেনে নিয়ে বিভিন্ন অংশের সমষ্টির দ্বারা স্বপ্নের প্রকৃত ও সম্পূর্ণ অর্থ আবিষ্কার করা হয়। প্রায়ই দেখা যায় যে অনেক রোগী, যাদের সবেমাত্র সমীক্ষণ করতে আরম্ভ করা হয়েছে, তারা এই সমীক্ষণের সময় এমন সব স্বপ্নের কথা বলে যার ব্যাখ্যা করা খুবই সহজ। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। লেখকের একটি রোগিণী স্বপ্নে 'তিনটি শবাধার দেখলেন। এর পরেই তাঁর মা, বোন ও ভাই সেই ঘরে এসে ঢুকলেন'। রোগিণী পরে প্রকাশ করেছিলেন যে এই তিনজন আত্মীয়ের সঙ্গে তাঁর খুবই শক্রতা ছিল। সুতরাং এটা খুব আশ্চর্যের বিষয় নয় যে রোগিণী এই সব আত্মীয়দের মৃত্যু-ইচ্ছা এই স্বপ্নের ভিতর দিয়ে চরিতার্থ করেছেন।

একটি স্বপ্ন বিশ্লেষণ করলে রোগীর রোগের কারণ সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা যায়। একজন তোৎলা রোগী একটি স্বপ্নের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে তিনি স্বপ্নে দেখলেন—"একটি মেয়ের সঙ্গে তিনি অবৈধভাবে যৌন-আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করছেন। তার পরে তিনি নীচের তলায় নেমে গেলেন। সেখানে তাঁর পিতা একটি রাজমিস্ত্রির কর্ণিক নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন এবং খানিকটা মাখা-সিমেণ্ট তাঁর গলার মধ্যে ঢেলে দিয়ে বললেন—'এতে তুমি মিথ্যে কথা বলা শিখবে'।" এখন এই স্বপ্নটি থেকে মানে করা চলতে পারে যে রোগীটির "নিষিদ্ধ-ইচ্ছা" এবং তাকে দমন করবার চেষ্টার শাস্তি-স্বরূপ এই তোৎলামির উৎপত্তি হয়েছে।

স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে সমীক্ষক সংক্রমণের বিষয়ও অনেক কিছু জানতে পারেন। যে রোগীর সমীক্ষকের সঙ্গে 'সদর্থক সংক্রমণ' (positive transference) হয়েছে, সে হয়ত স্বপ্নে দেখতে পায় যে সমীক্ষক অত্যন্ত দয়ালু ও অতি চমৎকার লোক। লেখকের একজন রোগী

স্বপ্ন দেখেছিলেন যে—"সমীক্ষণ-কার্যের পর তাঁকে চায়ের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়েছিল"। যে সব রোগীর 'নঙর্থক' (negative) সংক্রমণ হয় তারা সমীক্ষকের প্রতি বিদ্বেষভাব বশতঃ হয়ত স্বপ্ন দেখে যে সমীক্ষক অত্যন্ত অপ্রিয় এবং স্বপ্নে অনেক খারাপ ঘটনার সঙ্গে জড়িত অবস্থায় সমীক্ষককে দেখতে পায়।

ফ্রয়েড স্বপ্নকে 'নির্জ্ঞান মনে পৌঁছাবার রাজপথ' বলেছেন, কিন্তু নির্জ্ঞান মনকে জানতে হলে সব সময়েই খুব সাবধানে ও সতর্কভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে হবে। প্রতীক বিচারেও এই সাবধানতার প্রয়োজন। সব প্রতীকেরই অর্থ প্রথম আবিষ্কার হয়েছিল। অবাধ-ভাবানুষঙ্গের দ্বারা কিন্তু পরে দেখা গেল যে কতকগুলি প্রতীক সর্বদাই বা বেশীর ভাগ সময়েই একই অর্থ বোঝাচ্ছে। স্বপ্নেতেও এরকম হতে পারে। স্বপ্নে যে সব জিনিষ প্রতীকরূপে প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলির সত্যতা নির্দ্ধারণ করা কঠিন নয়। এই সব শব্দগুলি নিয়ে রোগীর সঙ্গে অবাধ-ভাবানুষঙ্গ করলেই এদের সত্যতা স্পষ্ট বোঝা যায়। ইয়ুঙ্ এই প্রতীকগুলিকে খুব সহজভাবে ও সার্বজনীনরূপে গ্রহণ করেছেন। রূপকথার গল্প ও পৌরাণিক ঘটনাগুলি ব্যাখ্যা করবার সময়ও এই প্রতীকগুলির ব্যবহার করেছেন। এইরূপে ইয়ুঙ্ প্রতীক জিনিষটাকে রহস্যাবৃত করে ফেলেছেন। অনেক সময়ে দেখা যায় যে সব রোগীর সমীক্ষকের প্রতি ভালবাসার সঞ্চার হয়েছে অর্থাৎ সদর্থক সংক্রমণ হয়েছে, তারা নিজেদের অনেক জিনিষ সমীক্ষকের ঘর থেকে নিয়ে যেতে ভুলে যায়। সেই জিনিষের জন্যই তাদের আবার সমীক্ষকের কাছে ফিরে আসতে হয় এবং প্রিয় সমীক্ষকের আবার দেখা পায়। এই সব দেখে ফ্রয়েডের দৃষ্টি নির্জ্ঞান মনের অন্যান্য অনেক কার্যাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হল। এই সব কাজের

মধ্যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ভুল-ভ্রান্তি—যেমন কথার ভুল, লেখার ভুল প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে।

দৈনন্দিন জীবনের ভুল-ভ্রান্তিতে নির্জ্ঞান মনের অনেক কথাই জানতে পারা যায়। যে ব্যক্তি ভুল করছে তাকে এই ভুলের কথা বুঝিয়ে দিলে সে তা অস্বীকার করতে পারে না। ভুল-ভ্রান্তি আমাদের সকলেরই হয়ে থাকে। লেখকের একজন রোগিনীর নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছা কী ভাবে তাঁর ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল এখন সেই কথাই বলা যাক। এই মহিলাটির নানা কারণে তাঁর স্বামীর সঙ্গে আর মনের মিল ছিল না। ব্যাপার হল এই যে তিনি তাঁর দরজার চাবিটা কোথায় যে রাখতেন তা ভুলে যেতেন। ভুলে যাওয়া ছাড়াও মাঝে মাঝে তা হারিয়েও ফেলতেন। নতুন চাবি তৈরী করে নিলেও আবার সেটা হারিয়ে ফেলতেন। এই যে ভুল, এর কারণ অনুসন্ধান করে বা'র করা কঠিন নয়। এটা হয়ত সকলেই বুঝতে পারছেন যে এই চাবি হারানোর মূলে রয়েছে তাঁর গৃহে থাকার অনিচ্ছা। আপনারা সকলেই জানেন যে যদি বিবাহিতা মেয়েরা চিঠি লেখবার সময় ভুল করে তাদের কুমারী নাম সই করে তবে সেটাকে অমঙ্গল মনে করা হয়। এটা সত্যিই অমঙ্গলের চিহ্ন। কারণ অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে সে সত্যিই আবার কুমারী জীবনে ফিরে যেতে চায়।

লেখকের পরিচিত এক চিকিৎসকের মারাত্মক রকমের একটি ভ্রান্তির কথা এখানে বলা চলতে পারে। চিকিৎসকটি বার্মিংহামে একটি চাকরীর জন্য লণ্ডন থেকে দরখাস্ত করেন। একটি বিশেষ সভায় তাঁকে দেখা করতে লেখা হয়। চিকিৎকটির স্থির ধারণা হয় যে তাঁর মনোনীত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম; সুতরাং বার্মিংহামে দেখা

করতে যাওয়া বৃথা সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি যাওয়াই সিদ্ধান্ত করলেন। আশ্চর্যের বিষয় যে নির্দিষ্ট দিনে দেখা করতে যাওয়ার জন্য তিনি স্টেশনে গাড়ী ধরতে গিয়ে হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখেন যে তাঁর মানিব্যাগটি বাড়ীতে ফেলে এসেছেন। যাক্, শেষে তিনি যে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এটা স্টেশন-মাষ্টারকে বুঝিয়ে ট্রেনে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। এইরূপে নিজের ব্যক্তিত্বকে জাহির করে তিনি চালাকি দ্বারা তাঁর নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছাকে এড়িয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত কিন্তু তিনি চাকরীটি পেলেন না—তাঁর নির্জ্ঞান মনের ভবিষ্যৎবাণী ঠিকই হয়েছিল।

সাধারণ "কাজের ভুল-ভ্রান্তির" মত "কথার ভুল"ও মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে খুব মূল্যবান্। কথার ভুলের মধ্যে দিয়ে বক্তার প্রকৃত ইচ্ছা প্রকাশ পায়। এ সম্বন্ধে ফ্রয়েড একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীকে বলছেন—"আমাদের দু'জনের মধ্যে কেউ যদি মারা যাই, তা হলে আমি কিন্তু প্যারী সহরে গিয়ে বাস করব।" এ শুনে যে-কোন লোকই যুক্তিসহকারে সিদ্ধান্ত করতে পারে যে স্ত্রীর প্রতি স্বামীটির খুব ভাল মনোভাব নেই। আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যাক—একজন মহিলা (তাঁর স্বামীর ওপর খুব প্রভুত্ব ছিল) বলছেন—"আমার স্বামী আমার যা ভাল লাগে তাই খেতে পারেন।" চিকিৎসক প্রকৃত পক্ষে কিন্তু বলেছিলেন যে তাঁর স্বামীর যা ভাল লাগে তাই খেতে পারেন। কিন্তু স্ত্রী ভুল করে তাঁর স্বামীর ওপর নিজের প্রভুত্বটিকে এই ভুলের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে ফেললেন।

এই সাধারণ ভুল-ভ্রান্তির মত কথার ভুলের সঙ্গে পরিচয় ফ্রয়েডের ব্যাখ্যার অনেক আগেই আমরা বহু নাটকের মধ্যে পেয়েছি।

"লেখার ভুল" অনেকটা "কথার ভুলের"ই মত। মুদ্রাকরের যে

ভুল আমরা ছাপার মধ্যে পাই, তার ব্যাখ্যা 'কথার ভুলের' ব্যাখ্যারই অনুরূপ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সাধারণতঃ ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ক বইগুলিতেই ছাপার ভুল বেশী পাওয়া যায় কারণ এই সব বিষয়ের সঙ্গেই মানুষের প্রক্ষোভসমূহ বেশী জড়িত থাকে।

আমরা এ পর্যন্ত যে সব কথা বলে এসেছি সেগুলি আমাদের লক্ষ্য নির্জ্জান মনের অনুসন্ধানের জন্য খুব বেশী মূল্যবান্ নয়। কিন্তু নির্জ্জান মনের ইচ্ছা স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যে কৌশলে প্রকাশিত হয়ে পড়ে, সেই কৌশলেই "রসিকতার"ও (wit) প্রকাশ। এই কৌশল সম্বন্ধে এখন কিছু বলা যাক। আমরা দেখেছি যে স্বপ্নের বিকৃতির প্রথম কৌশল হচ্ছে সংক্ষেপণ। রসিকতার কৌশলের মধ্যেও এই সংক্ষেপণ জিনিষটি প্রায়ই থাকে।

অভিক্রান্তির কৌশলেও অনেক জিনিষ খেলো হয়ে যায়—এই অভিক্রান্তির জন্যই অনেক গুরু-চণ্ডালী দোষের সৃষ্টি হয় কারণ প্রকৃত জিনিষের সঙ্গে প্রক্ষোভ সংযুক্ত না হয়ে সেটা হয় অন্য জিনিষের সঙ্গে। এতে রসিকতার সৃষ্টি হয় বটে কিন্তু এ রকম রসিকতা অনেক সময় খুবই মারাত্মক। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। একটি লোক একটা দুর্ঘটনা বর্ণনা করবার সময় বলছে—"গাড়ীর চালকটির কপাল সত্যিই খুব মন্দ; দুর্ঘটনায় শুধু যে তার স্ত্রী ও ছেলে মারা গিয়েছে তা নয় তার ঘড়িটি পর্যন্ত ভেঙ্গে গিয়েছে।" এখানে ঘড়িটির মূল্য স্ত্রী পুত্রের জীবনের মূল্য অপেক্ষা বেশী করে ব্যক্ত হয়ে পড়েছে।

রসিকতার মধ্যে প্রতীকের ব্যবহারও খুব বেশী রকম দেখতে পাওয়া যায় এবং এতে রসিকতা খুব সুন্দর ভাবে ফুটে ওঠে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক—একবার মুসোলিনী (Mussolini) তাঁর সৈন্যবলকে আরও শক্তিশালী করার জন্য একজন বিখ্যাত রাসায়নিককে ডেকে পাঠালেন। রাসায়নিক রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় দু'ধারে টাঙানো

মুসোলিনীর ছবি লক্ষ্য করতে লাগলেন। তিনি আশে পাশের লোকের কথাবার্তা থেকে জানতে পারলেন যে তারা মুসোলিনীকে খুবই ভয় করে। তারপর তিনি মুসোলিনীর প্রাসাদে উপস্থিত হলেন। প্রাসাদের বিশ্রাম কক্ষে বসে তিনি মুসোলিনীর নানা ভঙ্গির ছবি খবরের কাগজে দেখতে পেলেন। ঐ কাগজগুলির বেশীর ভাগই মুসোলিনীর বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভর্তি। শেষে সেই বিখ্যাত মনীষীর ঘরে রাসায়নিকের ডাক পড়ল। অনেকক্ষণ হেঁটে যাওয়ার পর তিনি একাধিপতি মুসোলিনীর টেবিলের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মুসোলিনী কাজে ব্যাপৃত থাকায় রাসায়নিক যে তাঁর সামনে উপস্থিত হয়েছেন তা লক্ষ্যই করেন নি। হঠাৎ মুখ তুলে রাসায়নিককে দেখে প্রশ্ন করলেন, "বিজ্ঞানের আবিষ্কৃতসব চেয়ে মারাত্মক গ্যাস কী?" রাসায়নিক খানিকক্ষণ নীরব থাকার পর উত্তর দিলেন—"Incense" (Incense-এর অর্থ সুগন্ধ ধূপ ও রেগে আগুন হওয়া দুইই হয়)।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তের মধ্যে দিয়ে রাসায়নিকের নিষেধ অমান্য করার ইচ্ছা পরিপূরণ হচ্ছে। সর্বশক্তিমান একাধিপতি মুসোলিনীকে তিরস্কার করা এই সামান্য রাসায়নিকের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। কিন্তু প্রতীকটি (Incense কথাটি) ব্যবহার করার একাধারে তাঁর খোসামোদ ও ভক্তি দুইই প্রকাশ পেল ও অন্যধারে ভৎ'সনাও প্রকাশ পেল। রসিকতা যতই মার্জিত হয় ততই তার কৌশল প্রণালী কঠিন। কিন্তু অমার্জিত রসিকতাগুলি যা প্রেক্ষাগৃহে অথবা নীচুদরের মিলনান্ত নাটকে ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেগুলি সাধারণতঃ যৌন-সম্বন্ধীয় হয়। সুতরাং সেগুলির ব্যাখ্যা করা কঠিন নয়। যে সমস্ত রসিকতায় বিকৃতি খুব সামান্য সে সব রসিকতার প্রকৃত মানে বোঝার শক্তি এবং তার রস গ্রহণ করার ক্ষমতা খুব কম লোকেরই থাকে। এমন অনেক স্বপ্ন আছে, যে গুলি দেখে জেগে ওঠবার পর দর্শক অনেক সময় খুব কষ্ট অনুভব করেন। এই সব কষ্ট অনুভবের কারণ অনুসন্ধান করলে

দেখা যায় যে এই সব স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ দর্শক খুব সহজ ভাবে অনুভব করতে পারেন। এইরূপ স্বপ্নের অর্থ দর্শকদের কাছে খুব খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ পেয়ে যায় বলেই দর্শক কষ্ট পান। আমরা জানি যে নির্জ্ঞান মনের ইচ্ছাকে সংজ্ঞান মনে আসতে না দেওয়ার জন্য দায়ী প্রতিবন্ধ (resistance)। মাঝে মাঝে এইসব দমিত ইচ্ছাকে মার্জিতরূপে সংজ্ঞান মনে আনবার উপায় এই সব রসিকতা প্রভৃতি। স্বপ্নের বিষয়বস্তুগুলি পরীক্ষা করার পূর্বে স্বপ্ন গঠনের পূর্বাভাষ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। শ্রটার (Shrotter) এ সম্বন্ধে বেশ চমকপ্রদ পরীক্ষামূলক কার্য করেছেন। তিনি একজন রোগিণীকে সংবেশিত করে তাকে অভিভাবন (suggestion) দিলেন যে ঘুমন্ত অবস্থায় সে কোন অসংস্কৃত কামনা মূলক স্বপ্ন দেখবে এবং ঘুম ভাঙ্‌বার পরে স্বপ্নটি মনে রাখবে। তিনি অভিভাবন দিলেন যে স্বপ্নে রোগিণীটি তার একটি বান্ধবীর সঙ্গে সঙ্গম করবে। মেয়েটি স্বপ্ন দেখল যে তার বান্ধবীটি ছোট ব্যাগ নিয়ে তার কাছে এসে উপস্থিত হল। ব্যাগটির ওপর একটি লেবেল আঁটা ছিল "কেবল মহিলাদিগের জন্য"। যদি কেহ এরকম স্বপ্ন দেখেন তা হলে তিনি নিঃসন্দেহে ধরে নিতে পারেন যে এর অর্থ কামনামূলক এবং এই স্বপ্নের গঠনভঙ্গীও খুবই সরল। কেহ হয়ত বলতে পারেন যে এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আকস্মিক। কিন্তু যদি তাঁরা মদ্য-পান-জনিত মস্তিষ্কে ক্ষতিগ্রস্ত রোগীদের ওপর এইরূপ পরীক্ষামূলক কার্যাদির ফলাফলের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তবে আশা করি এর সত্যতা সম্বন্ধে তাঁরা নিঃসন্দেহ হতে পারবেন। বেট্‌লহাইম (Betlheim) ও হার্টম্যান (Hartmann) নামক দু'জন চিকিৎসক এরূপ কয়েকজন রোগীকে অসংস্কৃত যৌন-বিষয়ক একটি গল্প বললেন। কিছুদিন পরে এই চিকিৎসকদ্বয় তাঁদের রোগীদের নিকট বর্ণিত ঘটনাটি শুনতে চাইলেন। সব রোগীই গল্পটিকে অত্যন্ত বিকৃতভাবে বর্ণনা করল। স্বপ্ন তৈরী

হওয়ার সময় যেমন ভাবে বিকৃত হয়, দেখা গেল বর্ণিত ঘটনার এই সব বিকৃতিও একই প্রণালীর।

স্বপ্নে দৃষ্ট কোন ঘটনার সত্যতা আছে কিনা সে সম্বন্ধে কোন কথাই আমরা তুলব না। স্বপ্নের উৎপত্তি ও গঠন প্রণালী, যা ফ্রয়েডের আবিষ্কারগুলির মধ্যে পাই—শুধু তাই আমাদের আলোচনার বিষয়।

এখন আমরা মানসিক রোগ-সমূহের লক্ষণগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারি। পূর্বে আমরা নির্জ্জান মনের ইচ্ছা প্রকাশের বহুবিধ পন্থা আলোচনা করেছি। এখন এই সব পন্থাগুলি মানসিক-রোগের লক্ষণ-গঠন প্রণালী-টিকে বুঝতে অনেকটা সাহায্য করবে।

ফ্রয়েড প্রথমে ভেবেছিলেন যে "অভিক্রান্তি"-কৌশলই এই লক্ষণগুলির উৎপত্তির প্রধান কারণ। স্বপ্নের বিকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে এই অভিক্রান্তির গুরুত্ব আমরা দেখেছি। সাধারণতঃ প্রক্ষোভসমূহ ভয়াত্মক হয় এবং এই ভয় প্রকৃত বিষয়বস্তু থেকে অভিক্রান্ত হয়ে কোন অপেক্ষাকৃত কম প্রতিরোধক বস্তুর সঙ্গে জড়িত হয়। এখন দেখা যাক যে ভয় বা উৎকণ্ঠা কথাটির অর্থ কী এবং মানসিক জীবনের ওপর এর গুরুত্ব কতখানি। যখন আমরা কোন হিংস্র জন্তু দেখি তখন তাকে দেখেই প্রস্তুত হই কিন্তু জন্তুটি যদি আমাদের অজানা হয় বা একই ধরণের ঐরূপ কোন জন্তুর সঙ্গে যদি আমাদের পরিচয় না থাকে তাহলে আমরা ভয় না-ও পেতে পারি। উদ্বায়ু-জনিত (neurotic) উৎকণ্ঠার সত্যিকারের কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কখন কখন এই সব উৎকণ্ঠাকে কোনও বিশেষ বস্তুর সঙ্গে জড়িত থাকতে দেখা যায়। রোগীর ঐ সব বস্তুর ওপর খুবই ভয় হয়। ধরুন উদাহরণস্বরূপ বলা চলতে পারে যে একটি লোক বিড়াল দেখলেই ভয় পায়, যদিও এটা সত্যি যে বিড়াল দেখে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। তবে লোকটি ভয় পায়

কেন? ফ্রয়েড বলেছেন—"এই যে ভয়, এর প্রকৃত উৎপত্তির কারণ হচ্ছে, কোন অন্তর্নিহিত ভয় এবং এই ভয়েরই বাইরের প্রকাশ হচ্ছে কোন বিশেষ বস্তুর মধ্যে দিয়ে। কিন্তু কেন এমন হয়? প্রকৃত ভয়টা যাতে হওয়া উচিত ছিল তাতে না হয়ে, এই বিশেষ বস্তুতে অভিক্রান্ত হওয়ার কারণ এই যে লোকটির অন্তর্নিহিত বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব হয় বলে বাইরের কোন বস্তুর ওপর তার "ভয়" অভি-ক্রান্ত করে। যদি ভয় বিড়ালের ওপর অভিক্রান্ত হয়, তা হলে সে বিড়ালকে এড়িয়ে চলে সংজ্ঞান মনে শান্তি আনতে পারে।

এইরূপ অভিক্রান্তির একটি দৃষ্টান্ত লেখক নিজেই দেখেছিলেন। একটি যুবক কসাইয়ের কাজ করত। প্রাণী-হত্যা প্রভৃতি কসাইয়ের কাজে সে অত্যন্ত আনন্দ পেত। যদিও লোকটির বাইরের ব্যবহার নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিল না তবুও এইরূপ হত্যাকার্যে তার আনন্দই হত। একটি কসাই-খানার ভার এই যুবকটির ওপর ছিল। দোকানটির উন্নতির দায়িত্ব ছিল তারই ওপর এবং কোন লোকসান হলে মালিকের কাছে কৈফিয়তও তাকে দিতে হত। দুঃখের বিষয় যে দোকানের এই গুরু দায়িত্ব নেওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই তার দোকানের পাশে আর একটি দোকান হল। এতে তার ব্যবসার খুব ক্ষতি হতে লাগল। এ খবর দোকানের মালিকের কানে গেলে তিনি দোকান সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য একজন পরিদর্শক নিযুক্ত করে তাকে দোকানে পাঠিয়ে দিলেন। পরিদর্শক যুবকটিকে নির্দয়ভাবে তিরস্কার করতে লাগলেন এবং পাশের দোকানের জন্যই যে এই ক্ষতি হচ্ছে সে সব কোন কথাই মেনে নিতে রাজী হলেন না। পরিদর্শকের এই যুক্তিহীন ব্যবহারের জন্য যুবকটি খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠল কিন্তু রাগ প্রকাশ করতে পারল না, কারণ তাতে তার চাকরী চলে যেত। তার এই রাগ দমন করার সময়ে সে সামনে একটি ছুরি পড়ে

আছে দেখতে পেল। এত উত্তেজনা সত্ত্বেও যুবকটি খুব স্থির থাকতে চেষ্টা করল এবং তার রাগ দমন করে নিল। পরে যুবকটি বলেছিল যে, সে যদি নির্দয় পরিদর্শকটিকে ছুরিকাঘাত করতে পারত তবে হয়ত সে অনেকটা শান্তি পেত। এই ঘটনার কিছুদিন পরে একটি অদ্ভুত কাণ্ড হতে আরম্ভ হল। যুবকটি ছুরি দেখলেই ভয় পেত এবং তার ভয় হত যে, যে-কোন সময় সে কাকেও ছুরিকাঘাত করতে পারে। এই ভয় ক্রমে এতই প্রবল হয়ে উঠল যে সে ভোঁতা ছুরি প্রভৃতিও আর ব্যবহার করতে সাহস পেত না। এখন আপনারা হয়ত বুঝতে পারছেন যে প্রকৃতপক্ষে যুবকটির রাগের সময়ে পরিদর্শককে মেরে ফেলতে ইচ্ছা হয়েছিল। তা না হলেও অন্ততঃপক্ষে পরিদর্শককে ছুরিকাঘাত করতে ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু চাকরী যাওয়ার ভয়ে সে তা করতে পারে নি। এই মারার ইচ্ছা পূরণ না হয়ে অবদমিত হল। কাউকে মেরে ফেলতে পারে এই আশঙ্কাই সত্যিই মেরে ফেলবার প্রকৃত ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করেছিল এবং এই ভয়ই অস্ত্রের ওপর অভিক্রান্ত হল (যে অস্ত্র সে সাধারণতঃ ব্যবহার করত)। এই ঘটনাটি খুব সংক্ষেপেই আমরা বললাম। এটা সবিস্তারে বর্ণনা করলে সূক্ষ্ম বিষয়গুলি আলোচনা করবার সুবিধা হয় বটে কিন্তু এর থেকেই আপনারা হয়ত বুঝেছেন যে কী করে নিষিদ্ধ ইচ্ছা থেকে ভয়ের উৎপত্তি হতে পারে এবং তা থেকে নিজের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করা যেতে পারে।

অভিক্রান্তি-কৌশল বোঝাতে আরও সহজ দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। একটি যুবক তার নিজের বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছিল কিন্তু তার মা এতে বাধা দিলেন। কিছুদিন পরে এই যুবকটির একটি ভয়ের লক্ষণ প্রকাশ পেল। তার ভয় হত যে তার শ্বাস-বায়ু স্বাভাবিক ভাবে চলাচল করছে না। লণ্ডনের প্রায় সমস্ত হাসপাতালে সে চিকিৎসার জন্য গেল, কিন্তু

নানারূপ পরীক্ষা করেও তার কোন রোগ ধরা পড়ল না। সে তখন ভাবল যে তার নাকেই কোনরূপ দোষ হয়েছে এবং এবার সে কান-নাক ও গলার হাসপাতালগুলিতে পরীক্ষা করাল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এবারেও কোন রোগ ধরা পড়ল না। তখন সে লেখকের তত্ত্বাবধানে এল। লেখক যুবকটির সাংসারিক জীবনের খুঁটি-নাটি বিষয় সম্বন্ধে তার সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন। সাংসারিক অস্বচ্ছলতার জন্য তাকে মনঃসমীক্ষণ করা সম্ভব না হলেও লেখক তার কষ্টের অনেকটা লাঘব করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং পরে যুবকটি বিয়ে করে সুখে ঘর-সংসার করেছিল। এখানে দেখা যাচ্ছে যে তার বিয়েতে তার মায়ের বিপক্ষপাতিত্বের দরুণ উৎকণ্ঠা যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা থেকে তার শ্বাসপ্রণালীর ওপর অভিক্রান্ত হয়েছিল এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে পেরেছিল, ততক্ষণ সে শ্বাসপ্রণালীর অস্বস্তি বোধ করছিল। তার এই উৎকণ্ঠা কেন যে শ্বাসপ্রণালীর ওপর অভিক্রান্ত হয়েছিল (অন্য কোন জিনিষের ওপর না হয়ে) তা বলা যায় না, তবে এটুকু বলা চলতে পারে যে হয়ত মায়ের বিপক্ষপাতিত্বের জন্য তার যে দুঃখ বা কষ্ট তার চেয়ে নিজের শ্বাসপ্রণালীর কষ্টকে অনেক কম যন্ত্রণাদায়ক বলে মনে করেছিল।

অভিক্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে আরও দু'টি জিনিষ মানসিক জীবনে প্রায়ই ঘটে থাকে। একটির নাম অন্তঃক্ষেপ (introjection), অপরটির নাম অভিক্ষেপ (projection)। অভিক্ষেপ প্রণালীটি বোঝা সহজ বলে এইটাই প্রথমে আলোচনা করা হচ্ছে। নিজের অপ্রীতিকর অনুভূতি বা চিন্তা বহিষ্করণ করে কোন বস্তু বা ব্যক্তির ঘাড়ে চাপানোকে বলে অভিক্ষেপ। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন, আমরা যেমন সাধারণ কথায় বলে থাকি, "নাচতে না জানলে উঠানের দোষ"। যে নাচছে, তার মন কিছুতেই স্বীকার করতে

চায় না যে সে ভাল নাচতে জানে না এবং তখন নিজের দোষ উঠানের ওপর চাপায়। আমাদের জীবনে এরূপ ঘটনা অহরহ ঘটে থাকে। মিথ্যাবাদীরা প্রায়ই অন্যদের মিথ্যাবাদী বলে থাকে। অবিবাহিতা বয়স্কা মহিলারা তাঁদের নির্জ্ঞান মনের যৌন-ইচ্ছাকে প্রতিবেশীর ঘাড়ে চাপিয়ে তাদের অযথা দোষারোপ করে থাকেন এবং নিরীহ ভাল মানুষকে দোষ দিতে তাঁরা কুণ্ঠিত হন না।

আমরা এর আগে দেখেছি যে যখন কোন যন্ত্রণাদায়ক ঘটনা বা অনুচিত ইচ্ছা অবদমিত হয় এবং সংজ্ঞান মনে আসতে পারে না, তখনই "অমূল প্রত্যক্ষের" (hallucination) উদ্ভব হয়। যখন কোন রোগী তার নিজের যন্ত্রণাদায়ক মনোভাব বা নিষিদ্ধ ইচ্ছার বিষয় আলোচনা অপরে করছে বলে মনে করে, তখন বুঝতে হবে যে রোগী তার নিজের অসামাজিক ইচ্ছা সম্বন্ধে অনুভূতি বাইরের পরিবেশের ওপর চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়।

এখন একটি মানসিক রোগের উৎপত্তির কথা আলোচনা করা যাক। এই প্রকারের মানসিক ব্যাধি যার হয় সে সাধারণতঃ নির্জনতাপ্রিয় ও অসামাজিক হয়। তার প্রথমে মনে হতে থাকবে যে সকলে যেন তার প্রতি বেশী রকমের আগ্রহ দেখাচ্ছে। তারা যেন তার প্রতি সন্দেহজনক ভাবে তাকাচ্ছে, এমন কি অবজ্ঞাও প্রকাশ করছে। তারপর তার মনে হতে থাকে যে লোকজন তাকে নিয়ে বেশ আলোচনা সুরু করেছে। রাস্তায় বেরিয়ে যদি কোন লোকের হাসি সে শুনতে পায়, তখনই ভাবে যে তাকে লক্ষ্য করে হাসা হচ্ছে। তার হয়ত মনে হয় যে বাইরের লোকেরা বলছে যে তার গায়ে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে, কারণ অতীত জীবনে তার কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। ক্রমে ক্রমে তার এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে এ সমস্তের জন্য কোন একটি ব্যক্তি সম্পূর্ণ দায়ী। ব্যক্তিটি নিশ্চয়ই তার

বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাকে দোষী সাব্যস্ত করতে চাইছে। এখন দেখা যাক যে রোগীর এই মানসিক লক্ষণগুলির জন্য অভিক্ষেপ প্রণালী কতটুকু দায়ী। রোগী নিজেই তার গূঢ়ৈষা-বিষয়ক অনুভূতিগুলি বাইরের পরিবেশের ওপর অচেতন ভাবে নিক্ষেপ করছে এবং তার নিজের "দোষী"-মনোভাব থেকেই ভাবনা সুরু হয়েছে যে সব লোকেই তার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে। সে তখন যে দোষই করে থাকুক না কেন সে সম্বন্ধে অনুভূতি বাইরের জগতের ওপর আরোপ করে এবং সেই জন্যই তার মনে হয় যে সকলে তাকে চোর বলছে। বাইরে থেকে যে সব দোষারোপ করা হচ্ছে, সে সব কথা যখন সে ভাবে তখন তার মন আঁৎকে ওঠে এবং এইসব কাজ যে সে করতে পারে এসব কথা ভাবতে সে অস্থির হয়ে পড়ে। সকলেই তার প্রতি এরূপ ব্যবহার কেন করবে, তারই কৈফিয়ৎ স্বরূপ সমস্ত জিনিষটাকে সে যুক্তিসঙ্গতভাবে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে ধরে নেয়। একেই বলে "যুক্ত্যাভ্যাস" (rationalisation)। ক্রমে ক্রমে রোগীর অভিক্ষেপ অধিক সংখ্যক জিনিষের ওপর হতে থাকে এবং রোগী বিশ্বাস করতে থাকে যে জগতের প্রত্যেকেই যেন তার গোপনীয় সমস্ত বিষয়ই জানে এবং এর জন্য সে খুবই উদ্বিগ্ন হতে থাকে। অভিক্ষেপ যে সব সময়ে এক ধরণের হবে তার কোন মানে নেই। কখনও কখনও এরূপও হতে দেখা যায় যে রোগী ভাবে তার চিন্তাধারাগুলি বাইরে আপনা থেকেই ছড়িয়ে পড়ছে অথবা বাইরের লোক কোন উপায়ে জেনে নিচ্ছে। অভিক্ষেপ প্রণালীর সাহায্যে রোগী বিশ্বাস করে যে তার চারিপাশের সব লোকই চোর অথবা কামপ্রবৃত্তিপূর্ণ। রোগী কখনই ভাবেনা যে যেসব দোষ সে বাইরের জগতের ওপর আরোপ করছে সেগুলি প্রকৃত পক্ষে তার নিজেরই এবং একথা তাকে ভালভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেও কোন ফল হয় না, বরং রোগী তাতে আরও রাগান্বিত হয়ে যেতে পারে। অবিবাহিতা বৃদ্ধা কোন

যুবকের চরিত্র সম্বন্ধে কুৎসা রটনা করছে এবং মনে করছে যে যুবকটি তার সঙ্গে প্রেমে পড়েছে—অভিক্ষেপের এরূপ দৃষ্টান্ত খবরের কাগজে অনেক দেখতে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে এইটাই সত্য যে, বৃদ্ধাটিই যুবকটিকে ভালবাসে এবং অভিক্ষেপের-সাহায্যে নিজের দোষ যুবকটির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। আচ্ছা, অভিক্ষেপ প্রণালীর সাহায্যে বৃদ্ধাটীর কি সত্যকারের কোন উপকার হচ্ছে? হ্যাঁ, প্রথমতঃ, সে যে যুবকটির সাথে প্রেমে পড়েছে এটা নিজের কাছে লুকাতে পারছে এবং দ্বিতীয়তঃ এরূপ হওয়ার দরুণ যুবকটি যাতে সত্যই তার প্রেমে পড়ে তার চেষ্টা করা হচ্ছে।

অভিক্ষেপের চেয়ে অন্তঃক্ষেপ প্রণালীর প্রতি আমরা কম নজর দিই। এটা খুবই দুঃখের বিষয়, কারণ অন্তঃক্ষেপ মনোজগতের একটি মূল গঠন প্রণালী এবং এর ক্রিয়াকলাপ খুবই চমকপ্রদ। যখন আমরা কোন প্রেমাস্পদকে হারাই, তখনই এই অন্তঃক্ষেপ কৌশলটি বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয়। এক্ষেত্রে হারানো প্রেমাস্পদের প্রতিরূপ নিজের মনের সঙ্গে মিলিয়ে একত্রীভূত করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত হারানো প্রেমাস্পদ "অহম্" (ego)-এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। শিশুদের "অস্মিতা" (personality) গঠন এই অন্তঃক্ষেপের পরিমাণের ওপরই অনেকটা নির্ভর করে। অন্তঃক্ষেপ প্রণালীটি সম্পূর্ণভাবে নিজের অজ্ঞাতসারে হয়। এই প্রণালীটি কিন্তু ঠিক অনুকরণ প্রণালীর মত নয় কারণ অনুকরণ ব্যাপারটি জ্ঞাতভাবেই করা হয়ে থাকে। আমাদের নির্জ্ঞান মনের একটি প্রবল বাসনা হচ্ছে, ঘৃণ্য বস্তুগুলিকে অভিক্ষেপ করা এবং প্রিয়বস্তুকে অন্তঃক্ষেপ করা। সাধারণতঃ দেখা যায় যে শিশুরা তাদের পিতামাতার চরিত্রকে নিজেদের মধ্যে অন্তঃক্ষেপ করে। একথা বুঝতে অসুবিধা হবে না যখন আপনারা চলতি কথায় শুনতে পান যে, ছেলেটি ঠিক বাপের মত হয়েছে।

অন্তঃক্ষেপ অভিক্ষেপের মত স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না বটে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আমরা এর প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে থাকি। উদাহরণস্বরূপ ধরুন—একটি মেয়ে অনেকদিন ধরে তার রুগ্ন পিতার শুশ্রূষা করছিল—পিতার ক্যান্সার রোগ হয়েছিল। মেয়েটি খুব ধৈর্যের সহিত সেবা শুশ্রূষা করেও তার পিতাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারল না। পিতার মৃত্যুর পরেই মেয়েটির ধারণা জন্মাল, তারও যেন ক্যান্সার হয়েছে। সাধারণ লোকেরও এই মনে হবে যে মেয়েটি সব সময় তার পিতার ক্যান্সার রোগের কথাই ভাবত; এই অত্যধিক ভাবনা থেকেই এই রোগ-লক্ষণগুলি তার মধ্যে দেখা দিয়েছিল। মোটামুটিভাবে এইটুকু বলা যেতে পারে যে মেয়েটি নির্জ্ঞাতভাবে তার স্নেহময় পিতার সঙ্গে বিচ্ছেদ কোন মতেই সহ্য করতে পারছিল না বলে সে পিতাকে অন্তঃক্ষেপ করেছিল এবং এইরূপে পিতার সঙ্গে তার "একাত্মীকরণ" (identification) হয়েছিল। পিতাকে অন্তঃক্ষেপ করে সে ভাবত যে সে যেন নিজের পিতাতেই রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। সে পিতার সহিত একাত্মীকরণ করে তাঁর সমস্ত গুণ ও রোগ গ্রহণ করেছে। কয়েক বছর আগে লেখক এই "অন্তঃক্ষেপ"-করণের একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখেন। একটি তিরিশ বছরের মহিলা কেবলই অনুযোগ করতেন যে তাঁর তলপেটের সম্মুখাংশ নেই। তাঁর এই মিথ্যা ধারণা দূর করার চেষ্টা করলে তিনি বলতেন—"হ্যাঁ, দেখলে অবশ্য মনে হবে যে সামনের অংশ আছে, কিন্তু আসলে তা নয়।" বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অনুসন্ধান করার পর জানা গেল যে মহিলাটির এই অহেতুক ধারণা জন্মাবার কয়েকমাস পূর্বে তিনি একটি সন্তান প্রসব করেন। শিশুটি ছিল বিকলাঙ্গ এবং সত্যিই তার তলপেটের সম্মুখাংশ ছিলনা। মহিলাটির সন্তানটাকে দেখবার দুর্দমনীয় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে তার সন্তানটি দেখানো হয়নি কিন্তু তিনি তাঁর স্বামীর

নিকট থেকে তার সন্তানের অদ্ভুত আকৃতির কথা শুনেছিলেন। এখন সহজেই বোঝা যাবে যে মহিলাটি তাঁর মৃত বিকলাঙ্গ সন্তানের আকৃতি নিজের মধ্যে অন্তঃক্ষেপ করেছিলেন এবং এই প্রকারে সন্তানের সহিত একাত্মীকরণ করেছিলেন। মৃত সন্তানকে মহিলাটি তাঁর নিজের অংশ বলে মনে করতেন এবং সন্তানের সমস্ত লক্ষণগুলি, এমন কি তার বিকৃত কুক্ষীও নিজের মধ্যে অন্তঃক্ষেপ করার দরুনই তাঁর অহেতুক লক্ষণগুলি দেখা দিয়েছিল। শোকাভিভূত লোকের মধ্যে এই অন্তক্ষেপ প্রণালীর কিছুটা দেখতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে শোকাভিভূত ব্যক্তিটি মৃত প্রিয়জনের চরিত্রকে নিজের মধ্যে অন্তঃক্ষেপ করে। অনেক সময় দেখা যায় যে ছেলেরা ভবিষ্যতে তাদের পিতার পেশা গ্রহণ করে এমন কি খুব ছোট বয়সে পিতা মারা যাওয়া সত্ত্বেও অনেক বালককে ভবিষ্যতে পিতার গুণাবলী পেতে দেখা যায়। এই অন্তঃক্ষেপ প্রণালী অনেক সময় ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে। অনেক সময় ছেলের কাছে তার মৃত পিতার গুণাবলী খুব বাড়িয়ে বলা হয়। ছেলে কিন্তু এর সত্যাসত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সে এই বাড়ানো কথা থেকে পিতার সম্বন্ধে নিজে খুব উচ্চ ধারণা করে নেয় এবং এই ধারণাটিকে নিজের মধ্যে অন্তঃক্ষেপ করে। কিন্তু পিতার অবর্তমানে তাঁর সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা গঠন করা তার পক্ষে সম্ভব নয় বলে সে নিজের আদর্শে পৌছাতে পারে না।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই অন্তঃক্ষেপ ও অভিক্ষেপ প্রণালী দু'টী কেন ঘটে? এটা দেখা গিয়েছে যে যন্ত্রনাদায়ক ঘটনার প্রক্ষোভসমূহ অপেক্ষাকৃত কম যন্ত্রনাদায়ক বস্তুতে অভিক্রান্ত হয়। যন্ত্রনাদায়ক ঘটনাকে এড়িয়ে চলা এবং মনোরম ঘটনাতে আকৃষ্ট হওয়াই শিশুর স্বভাবজাত বৃত্তি। যাতে শিশু আনন্দ পায় তাকেই সে অন্তঃক্ষেপ করে এবং এইটিই তার চরিত্রগঠনের

প্রধান সম্পদ। এইভাবে যেটা শিশুর ভাল লাগে না তাকে এড়িয়ে চলবার জন্য তার নিজের পরিবেশে অভিক্ষেপ করে। এই অন্তঃক্ষেপ ও অভিক্ষেপ প্রণালী মনকে অত্যধিক পরিমাণে প্রভাবান্বিত করলে শেষে এর থেকেও মানসিক ব্যাধি প্রকাশ পেতে পারে। ফ্রয়েডের এই গবেষণা মনোজগতের একটি বিশিষ্ট দান। শিশুরা যে তাদের পিতামাতাকে ভালবাসে এটা কিছু আশ্চর্যের নয় কিন্তু এমনও অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিশুরা যে শুধু পিতা মাতাকে ভালই বাসছে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণাও করছে। এখন দেখা যাক যে প্রিয় ও অপ্রিয় লোককে অন্তঃক্ষেপ করার ফলে শিশুদের কী অবস্থা হয়। আমরা আগেই দেখেছি যে এই অন্তঃক্ষেপ প্রাণালীতে শিশুরা অন্তঃক্ষিপ্ত ব্যক্তির প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা উচিত নিজেদের প্রতিও সেরূপ ব্যবহার করে। কারণ এখানে প্রিয় বা অপ্রিয় ব্যক্তিকে অন্তঃক্ষেপ করার ফলে সেই ব্যক্তিকে শিশু নিজের "অহম্"-এরই অংশ বলে মনে করে এবং সেইজন্য পিতা মাতার প্রতি তার যে প্রক্ষোভ সেটা নিজের ওপরে পতিত হয়। এই অন্তঃক্ষেপ প্রণালীর দ্বারাই বিষাদ-বায়ু (melancholia) রোগের সৃষ্টি হয়। রোগীর নিজের ওপর যে কাল্পনিক ঘৃণা তা বাহ্যরূপ গ্রহণ করে এবং এর দরুণ রোগী বিষণ্ণ মনোভাবাপন্ন হয় এবং শেষে এমন কি আত্মহত্যাও করতে পারে। আত্মহত্যা জিনিষটা নিজের প্রতি ঘৃণারই চরম পরিণতি। প্রায়ই দেখা যায় যে খুব বিষণ্ণ হলে লোকে দাঁত দিয়ে নিজের নখ কাটে বা গায়ের চামড়া টানে। এমন কি তারা অনেক সময় মাথার চুল ছিঁড়তেও কুণ্ঠিত হয় না। আহার করতে অসম্মতি জানায় এবং নিজের ওপর যতদূর ঘৃণা দেখান যেতে পারে চরম ভাবেই তা প্রকাশ করে। "বিষাদ বায়ু" রোগটি অত্যন্ত চমকপ্রদ হলেও আমরা এ নিয়ে আর বেশী মাথা ঘামাবো না; কারণ ফ্রয়েডের আবিষ্কৃত তথ্য সমূহের অনেক জিনিষই এখনও জানতে বাকী আছে। এখন আমরা "ইচ্ছা" সম্বন্ধে কিছু বলব। ফ্রয়েড এই ইচ্ছার অনেক

খানি গুরুত্ব দেখেছিলেন। ফ্রয়েডের মতবাদের কোন একটি অংশ মেনে নেওয়া মানেই তাঁর সমস্ত তথ্যগুলিকে মেনে নেওয়া, কারণ ফ্রয়েডের তথ্যের অংশগুলি পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ফ্রয়েডের শত্রুদের যত মুস্কিল এইখানেই। তাঁরা যদি তথ্যের কোন অংশ বিশেষকে সত্য বলে স্বীকার করেন তবে অন্য অংশগুলিকে তাঁরা আর অস্বীকার করতে পারবেন না অর্থাৎ সব তথ্যগুলিকেই মেনে নিতে বাধ্য হবেন। যদি কেউ মেনে নেন যে কথার ভুলের পিছনে কোন গুপ্ত ইচ্ছা আছে, তা হলে তাঁকে ফ্রয়েডের নির্দেশিত কাজের ভুলের ব্যাখ্যাও মেনে নিতে হবে এবং এর থেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যাকেও স্বীকার করতে হবে। ফ্রয়েডের ছোট্ট মেয়ে য়্যানা (Anna) পেটের অসুখের দরুণ সারাটা দিন খেতে না পাওয়ায় রাত্রে মুখরোচক খাদ্যের স্বপ্ন দেখেছিল। তার মুখরোচক খাবার খেতে ইচ্ছা হয়েছিল এবং তা থেকেই এই স্বপ্নটির উৎপত্তি হয়েছিল। এটা যদি আপনারা মেনে নেন তা হলে শেষ পর্যন্ত আপনাদের মানতেই হবে যে "ইচ্ছা" থেকেই সমস্ত স্বপ্নের উৎপত্তি। তা হলেই এখন দেখা যাচ্ছে যে যখন আপনি ফ্রয়েডের এই মতবাদকে মেনে নিলেন তখন অন্যান্য মতবাদকে অগ্রাহ্য করতে পারেন না, কারণ আগেই বলা হয়েছে যে ফ্রয়েডের তথ্যের অংশগুলি পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। স্বপ্ন ও হিষ্টিরিয়ার "স্বপ্ন-চারিতা"র (Somnumbolism) মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য নেই। এখানেও রোগীদের রোগ কোন ইচ্ছা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তা হলে এখন এটুকু বলা ভুল হবে না যে হিষ্টিরিয়ার লক্ষণগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত কোন "ইচ্ছা" আছে এবং "নিরন্তর স্বপ্নচারিতা"র (যাকে আমরা বলি বাতুলতা) জন্যও অন্তর্নিহিত ইচ্ছাই দায়ী। জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে আজ মানুষ তার আধিপত্য বিস্তার করেছে—এই মানুষকে বাইরের কোন শক্তিই বাধা দিতে পারে না—কিন্তু বাধা দিতে পারে তার একটি

ছোট্ট ইচ্ছা, যেমন একটি বিরাট যন্ত্রকে বন্ধ করে দিতে পারে একটি ধূলিকণা। যে-সব ইচ্ছা স্বাভাবিক চিন্তাধারার বাধাদায়ক, সেগুলি সরল এবং অতি সাধারণ বাসনা বা আকাঙ্খা নয়—এগুলি যৌন ইচ্ছা ও ঘৃণা। যদিও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এই সব ইচ্ছাকে সময়োপযোগী ধারায় রূপান্তরিত করা হচ্ছে তবুও এদের শক্তি অসীম। পরবর্তী অধ্যায়ে নির্জ্ঞান মন সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে কিন্তু এখন এটুকু আপনারা মেনে নেবেন যে এই সব ইচ্ছার দ্বারা চালিত হয়ে মানুষ যতটা খারাপ হওয়া উচিত ছিল, ততটা হয়নি। ফ্রয়েড বলেছেন যে মানুষের নিজের সম্বন্ধে যা ধারণা তার চেয়ে সে অধিকতর দুর্নীতি-পরায়ণ এবং অধিকতর সুনীতি-সম্পন্ন। নির্জ্ঞান ইচ্ছাকে চরিতার্থ না করতে পারলেই মানসিক রোগ হয় এ কথা সব সময় সত্য নয়, কারণ মানসিক রোগীরাও অপ্রত্যক্ষ ভাবে তাদের নির্জ্ঞান ইচ্ছাকে চরিতার্থ করে। রোগী প্রতীকের সাহায্যে পরোক্ষভাবেও ইচ্ছাকে চরিতার্থ করতে পারে। আমি অনেক সময় আমার রোগীদের (যারা তাদের নির্জ্ঞান ইচ্ছার জন্য অশ্বস্তি বোধ করছে বা ভেঙ্গে পড়েছে) এই বলে সান্ত্বনা দিতাম যে খুব ভাল লোকেরও নির্জ্ঞান মনে কুৎসিত জিনিষ থাকে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে কোথা থেকে অবদমনের সেই শক্তি আসে যে শক্তি মানুষের প্রবল ইচ্ছাকে শুধু বক্র পথে চালিত করতে পারে তা নয়, "ইচ্ছাকে" স্মৃতি থেকে বিলুপ্তও করে দিতে পারে।

এই প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ। যে কৃষ্টির প্রতিবেশে শিশু মানুষ হয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জ্ঞান লাভ করে, সেখান থেকেই তার এই অবদমনের শক্তি গড়ে ওঠে। এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে শিশুর প্রতিবেশের কৃষ্টি যতই সহজ ও সরল হবে ততই তার পক্ষে পারিপার্শ্বিক লোকদের ও তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা সহজ হবে।

অপর পক্ষে তার প্রতিবেশ যতই জবড়জং হবে, ন্যায়-অন্যায়ের কড়াকড়ি যত বেশী হবে এবং "এটা ক'রোনা" "ওটা ক'রো না" এই উপদেশ যত বেশী দেওয়া হবে ততই তার উচিত-অনুচিতের জ্ঞান বেশী জন্মাবে ও অবদমনের মাত্রাও বেশী হবে। শিশুকে ভয় দেখিয়ে শিক্ষা দেওয়ার লোক যতই বেশী হবে ততই তার দোষ-জ্ঞান বেড়ে যাবে এবং অবদমনের শক্তি প্রবল হয়ে উঠবে। উন্মাদগ্রস্ত রোগীদের সঙ্গে মিশলে দেখা যায় যে পিতামাতার আশ্রয়ে মানুষ না হয়ে তারা যদি উপযুক্ত পরিবেশে জীবন গঠন করতে পারত তা হলে শেষ পর্যন্ত তাদের এই পরিণতি হতনা। এমন অনেক অভিভাবকও আছেন যাঁরা শিশুদের না বলে সামান্য চিনি নেওয়াকেও চুরি আখ্যা দিয়ে তাদের গুরুতর অপরাধী বলে মনে করেন অথচ ছোট বেলায় না বলে চিনি খাওয়ার মত সামান্য অপরাধ আমরা অনেকেই করে থাকি। শিশুর এই অপরিচিত পৃথিবীতে জন্মানোর রহস্য উদ্ঘাটন করার ঔৎসুক্যকে অনেকেই গুরুতর নৈতিক অপরাধ বলে মনে করেন। যাঁরা শিশুর চারিপাশে সহজ সরল প্রতিবেশ সৃষ্টি করেন এবং শিশু-সুলভ ইচ্ছা ও ঔৎসুক্যকে গুরুতর অপরাধ বলে মনে করেন না, তাঁরাই আদর্শ পিতা মাতা। তাঁরা "খোকন্, এ করলে মা রাগ করবেন" কিম্বা "এ রকম কাজ খবরদার করবে না" এ সব কিছুই না বলে শিশুকে সত্যাসত্য জানাবার জন্য তার প্রতি দরদ নিয়ে সহজ ভাবে শিক্ষা দেন। অভিভাবকেরা অন্যের নিকট যে-ধরণের ব্যবহার চান, সেইরূপ ব্যবহারের মধ্য দিয়েই শিশুদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। যদি শিশুরা সত্যি-সত্যিই এরূপভাবে শিক্ষিত হয় তবে ভবিষ্যতে তাদের আর বেশী পরিমাণে অবদমন করার দরকার হয় না। অভিক্ষেপ, অন্তঃক্ষেপ ও অভিক্রান্তি-ও তাকে খুব বেশী রকম করতে হয় না—শুধু স্বাভাবিক মনের গঠনের জন্যে যেটুকু করা অত্যাবশ্যক সেটুকু ছাড়া। ফ্রয়েড তাঁর মানবতার

কাজের জন্য সাধারণ ও নগণ্য লোকদের নিকট থেকে লাঞ্ছনা ও অবহেলাও পেয়েছেন। ভবিষ্যতের মনোবিদ্যার ওপর ফ্রয়েডের আবিষ্কৃত তথ্যগুলির প্রভাব কতখানি পড়বে তা আমরা জানিনা, কিন্তু মানুষের সঙ্গে ভাল করে মিশেছেন এমন যে কোন লোকই মানসিক গঠন প্রণালী সম্বন্ধে ফ্রয়েডের তথ্যগুলির সত্যতা গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। ফ্রয়েড যদি কেবল অভিক্রান্তি, অভিক্ষেপ ও অন্তঃক্ষেপ এই তিনটি মাত্র প্রণালী আবিষ্কার করে যেতেন, তা হলেই তিনি জ্যানের (Janet) মত চির-স্মরনীয় হয়ে থাকতেন। কিন্তু তিনি করেছেন এর চেয়ে অনেক বেশী। মধ্য যুগের লোকেরা যেমন প্রথম শারীর-স্থানের (anatomy) চিত্র আঁকতে আরম্ভ করেন, ফ্রয়েডও তেমনি মানসিক গঠন-প্রণালীর আবিষ্কার করতে থাকেন। 'আজি হতে শত বর্ষ পরে' যদি তাঁর আবিষ্কৃত মনের গঠন-রীতির চিত্রাবলী একটু অদ্ভুত মনে হয় বা সেকেলে ধরণের লাগে তা হলে কিছুই এসে যাবেনা, কারণ এই সব কাজের পথ-প্রদর্শন তিনিই করেন।

দুই

আমরা এতক্ষণ নির্জ্ঞান মনের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে অনেক কিছু লক্ষ্য করে এসেছি এবং এটুকুও প্রমাণিত হয়েছে যে নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব প্রকৃতই আছে। এই নির্জ্ঞান মন সংজ্ঞান মনকে প্রভাবান্বিত করতে পারে। যত বেশী-সংখ্যক লোকের মন নিয়ে বিস্তারিত ভাবে বিশ্লেষণ করা যায় ততই নির্জ্ঞান মনের প্রকৃত অবস্থা ও তার ক্রিয়াকলাপ ভালভাবে জানা যায়। মানুষের অতীত জীবনের স্মৃতি ক্রমে ক্রমে উদ্ঘাটন করতে করতে যদি তার শৈশবের স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলা যায়, তা হলে আমরা তার বিভিন্ন বয়সের নির্জ্ঞান মনের অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষভাবে পরিজ্ঞান (insight) লাভ করতে পারি।

আমরা দেখেছি যে মনের যে অংশগুলির সহিত কোন যন্ত্রণাদায়ক প্রক্ষোভ থাকে অথবা মনের যে অংশগুলি সাধারণ চিন্তাধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম হয় না, সেই অংশগুলি সংজ্ঞান মন থেকে পৃথক হয়ে পড়ে এবং ক্রমশঃ নির্জ্ঞান মনে তলিয়ে যায়। এটা ধারণা করা যায় যে এই সব বিষঙ্গ (dissociated) স্মৃতির সমষ্টি যে-গুলি সংজ্ঞান মনে আসতে পারে নি, তাদের দ্বারাই নির্জ্ঞান মনের গঠন।

নির্জ্ঞান মনের গঠন প্রণালীর প্রকৃত রীতি যে এই-ই, তা বললে ভুল বলা হবে। তবে এটুকু ঠিক যে নির্জ্ঞান মন সংজ্ঞান মনের গঠনে অনেকটা সহায়তা করে। বিভিন্ন স্মৃতির সম্পূরণ (integration) দ্বারাই চেতনার উদ্ভব হয় এবং এই সম্পূরিত স্মৃতিগুলির সাহায্যেই অহমের উৎপত্তি—এইটাই সম্ভব বলে মনে হয়। এটা আশা করা যায় যে এই সব বিষক্ত স্মৃতিগুলি অধিকাংশই নির্জ্ঞানস্তরের আশে পাশে ভাসা-ভাসা অবস্থায় থাকে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে এই সব স্মৃতিগুলি সংজ্ঞান মন থেকে বিষক্ত হয়েছে, কারণ এক কালে এগুলি সেই-সব "ইচ্ছা" ছিল, যেগুলিকে সংজ্ঞান মনে আসতে দেওয়া হয় নি। স্বপ্ন ও নির্জ্ঞান মনের অন্যান্য কার্যাবলী একটু বিশদভাবে আলোচনা করলে নিঃসন্দেহ হতে পারা যায় যে এই সব "ইচ্ছা" নিষিদ্ধ যৌন-বিষয়ক অথবা হিংস্র প্রকৃতির।

ফ্রয়েড বলে গিয়েছেন যে তিনটি বিষয়ে মানুষ তার আত্ম-মর্যাদায় সবচেয়ে বেশী আঘাত পেয়েছে। প্রথমটি গ্যালিলিওর আবিষ্কার—পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। দ্বিতীয়টি ডারুইনের বিবর্তন-বাদ ও তৃতীয়টি হচ্ছে নির্জ্ঞান মনের প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার। প্রথমটায় মানুষ দুঃখ পেল এই জেনে যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড শুধু মানুষের জন্যই সৃষ্টি হয়নি। দ্বিতীয়টায় সে আরও বেশী দুঃখ পেল কারণ সে জানতে পারল যে যে-সমস্ত নিয়ম-কানুন দ্বারা পশু চালিত হয় সেই গুলিই মানুষকেও চালনা করে। শেষটিতে ফ্রয়েড দেখালেন যে বাহ্যিক জগতের সঙ্গে মেশবার সময় আমাদের শিষ্ট ব্যবহারের পিছনে এমন অনেক ইচ্ছা, প্রেরণা বাসনা ও প্রক্ষোভ থাকে, যে-গুলি আমরা মনে করতে সঙ্কুচিত হয়ে উঠি। একটু খোলাখুলি ভাবে বলা যাক। ফ্রয়েডের আবিষ্কারগুলি এই দেখিয়েছে যে আমাদের সঙ্গে পশুদের কতকগুলি বিষয়ে খুব বেশী তফাৎ নেই এবং

আমাদের নির্জ্ঞান মন অন্ততঃ গোড়ার দিক্‌টায় অবিকল পশুদেরই মত। এর পরে আমরা দেখব যে স্বকীয় প্রতিবেশ নির্জ্ঞান মনকে প্রভাবান্বিত ও তার অনেক পরিবর্তন সাধন করে।

এমন অনেক জিনিষ আছে যাতে মানুষ আনন্দ পায়না কিন্তু পশুরা পায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে পশুরা নিজেদের বিষ্ঠার ওপর গড়াগড়ি দিতে ভালবাসে। যাঁদের কুকুর নিয়ে বেড়াবার অভ্যাস আছে অন্ততঃ তাঁরা ত এ কথা জানেনই। পশুদের সঙ্গে যখন আমাদের মিল আছে, তখন এরূপ ইচ্ছা আমাদের হলে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? ভাল মানুষ গোছের লোককেও যদি বিষ্ঠাতে গড়াগড়ি দিতে বলা হয় তা হলে সেও স্থির থাকতে পারে না, রেগে আগুন হয়। শিশুদের ব্যবহার যাঁরা লক্ষ্য করেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে এই ধরণের পশু-সুলভ প্রবৃত্তি শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। পশুদের মত শিশুরাও অনেক সময় নিজেদের বিষ্ঠা নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটি করে। পশুরা অনেকক্ষেত্রে তাদের নিকটতম আত্মীয়ের প্রতিও শত্রুতা করতে দ্বিধা করে না, এমন কি অনেক সময় বধ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। পশুদের এরূপ ব্যবহার যদি মনুষ্য-সমাজে দেখা যায়, তা হলে এটা কি খুবই আশ্চর্য ঠেক্‌বে? আমাদের সমস্ত শিক্ষা এবং সংস্কারকে হার মানিয়ে যখন কোন ভাই তার ভাইয়ের ওপর শত্রুতা করে, তখন সেটা অনাত্মীয়ের ওপর শত্রুতার চেয়ে তিক্ত হয়ে ওঠে। সূক্ষ্মদর্শী বার্ণার্ড শ লিখেছেন যে মেয়েরা তাদের দিদির চেয়ে মাকেই বেশী ঘৃণা করে।

আমরা জানি যে পশুদের মধ্যে আত্মীয়দের সঙ্গে সঙ্গমে কোন বাধা নেই। পশু উৎপাদকেরা কখনও কখনও কোন শ্রেণী বিশেষকে বাড়ানোর জন্য ভাই-বোন অথবা মা-ছেলের সঙ্গে সঙ্গম করান। এতে কিন্তু তাদের সঙ্গমের আনন্দে কোন ব্যাঘাত বা ত্রুটি হয়না। তাদের উভয়ের মধ্যে যে

কোন সম্বন্ধ আছে তা তারা লক্ষ্যও করে না এবং এই সব ক্ষেত্রে কখনও সঙ্গমে কোন অনিচ্ছার ভাব তাদের মধ্যে দেখা যায় না। ফ্রয়েড যদি বলেন যে ঠিক্ পশুদেরই মত এই প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে থাকে তা হলে কি খুবই আশ্চর্য ঠেক্‌বে ? তিনি বলেন যে এইরূপ ইচ্ছা প্রায় সব সময়ে মানুষের নির্জ্ঞান মনে থাকে। মানুষ তার পশুত্ব স্বীকার করতে কখনও রাজী নয় বলে এইরূপ প্রবৃত্তি তার সংজ্ঞান মন থেকে বিতাড়িত হয়। নির্জ্ঞান মনের আলোচনা করা মানেই মানুষের অন্তরালে অবস্থিত পশু-মনোভাবের আলোচনা। অন্ধ-বিশ্বাস বা সংস্কার আঁকড়ে থাকলে মনোবিজ্ঞান জানা কখনও সম্ভব নয়—চোখের সামনে যা সত্য দেখব তাকে স্বীকার করে নিতে হবে। আমরা বলেছি যে মানুষ অনেকাংশে পশুরই সমান আবার অনেক বিষয়ে পশুর চেয়ে অনেক উচ্চে। পশুর চেয়ে মানুষ অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলে সে যে তার পশু-মনোভাব সবই কাটিয়ে উঠেছে, এ বললে খুবই ভুল করা হবে।

আমরা এখন ফ্রয়েডের আবিষ্কৃত "কামশক্তি" (libido) এবং তার "রূপান্তিকরণ" (transformation) ও "স্থানান্তর" (transposition) সম্বন্ধে আলোচনা করব।

প্রথমেই আমাদের বেশ ভালভাবে বুঝতে হবে যে "কামশক্তি"র মানে কী ? ইয়ুঙের ও ফ্রয়েডের ব্যবহৃত কামশক্তির অর্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের। ফ্রয়েড কামশক্তি বলতে প্রবল যৌন-বাসনাকেই বোঝেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে শিশুরা এই ধরণের আকাঙ্ক্ষা নিয়েই জন্মায়। যৌন-জীবনের ওপর এরূপ প্রাধান্য আরোপ করার ফলেই ফ্রয়েডের অনেক শিষ্যই—যাঁরা তাঁর মতবাদ সহজেই মেনে নিতে পারতেন, তাঁরাও সংস্কারবশতঃ এর থেকে দূরে থাকলেন। কিন্তু এটুকু ঠিক যে ফ্রয়েড যখন এসব তথ্যের আবিষ্কারক তখন তিনি নিশ্চয়ই তাঁর তথ্যগুলির সত্যতা

ভালভাবেই উপলব্ধি করেছেন। শরীরের যে-সব স্থানের মধ্য দিয়ে এই যৌন-আকাঙ্ক্ষাগুলি প্রবল ভাবে প্রকাশ পায় সেই সব স্থানগুলিকে "কামস্থান" বলে। ফ্রয়েডের মতে নবজাত শিশুর কামশক্তির প্রায় সমস্তটাই তার মুখেই কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে এবং তার চোষণের আকাঙ্ক্ষাও যৌন-আকাঙ্ক্ষা। এ কথাতে অনেকেই আঁৎকে উঠবেন। সত্যিই এরূপ যে হতে পারে এ ধারণা পূর্বে ছিল না। ফ্রয়েডের অনেক পূর্বে লিঁড্‌নার (Lindner) দেখেছিলেন যে শিশুরা চোষণের সময় অত্যধিক পরিমাণে আনন্দ পায় এবং খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠে। শিশুদের এই উত্তেজনা যখন শেষ সীমায় পৌছায় তখন সেটা হয় ঠিক্ আমাদের "রাগ-মোচনের" (orgasm) অনুরূপ। লিঁড্‌নার এটাও দেখেছেন যে শুধু যে খাদ্যের প্রয়োজনেই শিশুদের উত্তেজনা হয় তা নয়; যখন খাদ্যের প্রয়োজন নেই, তখনও শিশু চোষে, কারণ এর থেকে সে আনন্দ পায়। এতদিন লোকে শিশুদের সম্বন্ধে যা জেনে এসেছে তার কাছে এ ধারণা এতই অদ্ভুত যে এ তথ্যটিকে স্বীকার করা কঠিন হবে তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। মোটের ওপর এটা অস্বীকার করা শক্ত যে এই চোষণের দ্বারা শিশুরা খুবই আনন্দ পায়। আচ্ছা, কেবলমাত্র শিশুরাই কি চোষণে আনন্দ পায়, না বয়স্কেরা এরূপ উপায়ে আনন্দ লাভ করে? চুম্বনও যৌন-কার্যের অন্তর্ভুক্ত। এর সঙ্গে শৈশবকালের চোষণ কার্যের অনেক সম্বন্ধ আছে। অনেক লোকে "পাইপ্" চুষে যে আনন্দ পায় তা শৈশবকালের চোষণ কার্য ও তজ্জনিত আনন্দের অনুরূপ।

ফ্রয়েড শুধু 'মুখের' এক অবস্থা বর্ণনা করেছেন কিন্তু তাঁর ছাত্র আব্রাহাম্ (Abraham) এই অবস্থাকে আরও বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। আব্রাহামের এই আলোচনা ফ্রয়েড সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছেন বলেই আমরা আব্রাহামের গবেষণার তথ্যই আলোচনা করব।

এর পরের অবস্থায় "কামড়ানো" আসে। সাধারণতঃ এই অবস্থাটা শিশুদের দাঁত ওঠার পরেই হয়। এখন থেকেই শিশুরা খাবার চিবিয়ে খেতে আরম্ভ করে। এটা স্বীকার করা যায় যে শিশুরা যে কেবল খাবার খেতেই ভালবাসে তা নয়, এ ছাড়া তারা খাওয়ার ইচ্ছা না থাকলেও খাদ্যদ্রব্য (অন্য জিনিষও হতে পারে) চিবোতে ভালবাসে। শিশুদের অনেক সময় দাঁত উঠতে সাহায্য করার জন্য হাতীর দাঁতের আংটী কামড়াতে দেওয়া হয়। শিশুকে এমন জিনিষ কামড়াতে দেওয়া হয় যা তার পক্ষে ক্ষতিকারক নয় এবং জিনিষটাও নষ্ট হয় না। শিশুদের কামড়ানোর এই আনন্দের সঙ্গে পশুদের হাড় চিবানোর আনন্দের তুলনা করা যেতে পারে। (তামাক পাতা, চুইয়িং-গাম (chewing-gum), কোন মিষ্ট দ্রব্য কিম্বা রুমালের কোণ চিবোতে অনেক লোকই খুব আনন্দ পায়। এ সব জিনিষের উৎপত্তি এই "কামড়ান-অবস্থা"র সময়ই হয়। দাঁতই আক্রমণাত্মক অস্ত্র, সুতরাং এটা বলা যেতে পারে যে এই সময় থেকেই শিশুদের মধ্যে "ঘৃণা" বৃত্তিটির প্রকাশ পেতে থাকে। এই ঘৃণার খানিকটা নির্গম হয় খাবার চিবানোর মধ্যে দিয়ে কিন্তু কিছুটা অংশ পরিণত বয়সেও থেকে যায়, কারণ পরিণত বয়সে রাগলে অনেকেই দাঁত কট্‌মট্‌ করেন এরূপ দেখা যায়।

এর পরের অবস্থায় দেখা যায় যে মায়েরা তাঁদের শিশুদের দৃষ্টি মলত্যাগ কার্যের ওপর আকর্ষণ করান। শিশুরা শীঘ্রই জানতে পারে যে যে-সব ছেলেমেয়েরা সময়মত মলত্যাগ করে তারা ভাল আর যারা করেনা তারা মন্দ। আমরা দেখেছি যে শিশুদের আনন্দ চোষণ থেকে চিবানোতে পরিবর্তিত হয়েছে এবং এখন আনন্দস্থান বা কামস্থান চিবানো বা কামড়ান থেকে পায়ুতে (গুহ্য দ্বারে) পরিবর্তিত হয়। শিশুরা মলত্যাগকালে আনন্দ পায়, এখানেও শিশুদের সঙ্গে

পশুদের তুলনা করা যেতে পারে, কারণ পশুরাও মল নির্গমের সময় আনন্দ পায়।

শিশুরা মলত্যাগ যে পরিমাণে আয়ত্তাধীনে আনতে পারে, তাদের কামশক্তিও সেই পরিমাণে রূপান্তরিত হয়। শিশুরা এই সময়ে মলত্যাগের চেয়ে মলধারণেই বেশী আনন্দ পায়। শিশুদের এই ধরণের মনোভাব পরিণত বয়সেও অনেকের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়—তাঁদের মলত্যাগ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ থাকে না।

এ সব অবস্থা ছাড়াও অন্যান্য আরও অনেক জিনিষ ফ্রয়েড শিশুদের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন। তিনি দেখেছেন যে শিশুরা কোন পোষাক-আষাক গায়ে না দিয়ে উলঙ্গ অবস্থায় দৌড়াদৌড়ি করতে যেন বেশী ভালবাসে। তারা কোন লোককে পোষাক ছাড়তে বা পোষাক ছাড়া অবস্থায় দেখতে ভালবাসে। তারা অন্যকে আঘাত দিতেও ভালবাসে এবং আশ্চর্যের বিষয়, অনেক সময় আঘাত পেতেও ভালবাসে। পরের কথাটি শুনে অনেকে হয়ত স্তম্ভিত হয়ে যাবেন কিন্তু আপনারা হয়ত দেখেছেন যে শিশুরা অনেক সময় খাটের পায়ায় মাথা ঠুক্‌ছে। যদি তারা এই মাথা ঠোকাতে আনন্দ না-ই পেত তাহলে অযথা ইচ্ছা করে মাথা ঠোকার কারণ কী? কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে তারা নিশ্চয়ই মাথা ঠোকায় আনন্দ পায়।

শিশুদের দাঁত ওঠবার পর থেকে "মৌখিক" (oral) অবস্থার সময়ে "ঘৃণা"র উদ্ভব হতে দেখা যায়। এই মৌখিক অবস্থা পেরিয়ে শিশুরা যখন "পায়ু" অবস্থাতে আসে তখনও এই ঘৃণার খানিকটা রয়েই যায়। সুতরাং পায়ু অবস্থাগুলিও ঘৃণার সঙ্গে জড়িত।

এর পরেই শিশুদের কামশক্তি "উপস্থের" (genital) ওপর নিবদ্ধ হয়। শিশুরা উপস্থকে উত্তেজিত করে আনন্দ পায়। পূর্ণ বয়সে যৌন

আনন্দের স্বরূপ ও আস্বাদ শিশুরা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে "পাণিমেহনের" (masturbation) দ্বারা উদ্‌ঘাটন করে। পাণিমেহন কাজটি খুব দোষের নয় এবং এটাকে একটা বড় রকমের পাপ না বলে একটা স্বাভাবিক কিন্তু অপুষ্ট জিনিষ বলে মেনে নেওয়াই ভাল।

এর পরবর্ত্তী অবস্থাতে শিশুরা কোন বাহিরের বস্তুকে—অর্থাৎ নিজেদের দেহ থেকে পৃথক বাহ্যিক বস্তুকে ভালবাসতে শেখে। এখন তার কামধর্ম পরিণত বয়সোচিত। ফ্রয়েড শিশুদিগকে "বহুমুখকামী" আখ্যায় অভিহিত করেছেন। কারণ শিশুরা বহুবিধ উপায়ে কামসুখ উপভোগ করে। কাম-বিকৃতি সম্বন্ধে ফ্রয়েডের মত এত বিশদভাবে আলোচনা ও বর্ণনা আর কেহ করেন নি। সুতরাং শিশুদের সম্বন্ধে ফ্রয়েড যা বলেছেন তা খুবই মূল্যবান্। ফ্রয়েড বলেছেন যে শিশুরা যখন তাদের নিজেদের দেহ থেকে অর্থাৎ মুখ, পায়ু বা পাণি-মেহনের দ্বারা আনন্দ পায় তখন তাদের এই অবস্থাকে "স্বতঃকামী" (auto-erotic) অবস্থা বলা হয়।

এখন সম্ভবতঃ অনেকেই বলবেন তাঁরা যে উপরিলিখিত এই সব অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছেন, সে সব সম্বন্ধে তাঁদের ত কিছুই মনে নেই; সুতরাং এসব কথা অমূলক ও অর্থহীন। যাঁরা এসব কথা বলেন তাঁদের প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। কিন্তু তাঁরা যেন এটুকু ভেবে দেখেন যে আমরা এতক্ষণ যে সব আলোচনা করেছি, সে সবই নির্জ্ঞান মনের। বহু বছর ধরে বিশদভাবে রোগীর নির্জ্ঞান মন সম্বন্ধে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় গবেষণা করার ফলে নির্জ্ঞান মনের প্রকৃত রহস্য এবং গঠনপ্রণালী উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এক্ষেত্রে আপনাদের শিশুকালের অবস্থা মনে থাকবে সেটা বলা অন্যায় হবে। তা ছাড়া কেহ কি মনে রাখতে পারে যে কয়েকটি কোষ (cells) থেকে কিরূপে সে একটি ভ্রূণে পরিণত হয়েছে?

এর আগের অধ্যায়ে দেখান হয়েছে যে যে-সব জিনিষ শিশুর ভাল লাগে এবং যা সে ভালবাসে তাকে সে একাত্মীকরণ করে এবং নিজের মধ্যে অন্তঃক্ষেপ করে। আর যে সব জিনিষ শিশুদের ভাল লাগে না— তারা যাদের ঘৃণা করে সেগুলিকে পরিবেশে অভিক্ষেপ করে। শারীরিক গঠনের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সব মানসিক গঠনেরও ক্রমোন্নতি হতে থাকে। 'মৌখিক-অবস্থা'তে, যখন শিশুদের দাঁত ওঠে, তখন থেকেই তাদের অন্তঃক্ষেপ প্রণালী আরম্ভ হয় এবং 'পায়ু-অবস্থা'তে যখন শিশুরা মলত্যাগ করতে আনন্দ পায়, তখন থেকেই তারা অভিক্ষেপ আরম্ভ করে। এসব জিনিষের ওপর ফ্রয়েড কিরূপ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, আমরা তা ক্রমে ক্রমে দেখব।

আমরা ইডিপস্ গূঢ়ৈষা (Œdipus complex), যা নিয়ে অনেক বাক্-বিতণ্ডা হয়েছে ও হচ্ছে, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। যখন শিশু স্বতঃকামী অবস্থা অতিক্রম করে তার নিজের থেকে ভিন্ন বাহ্যিক কোন বস্তুকে ভালবাসতে শেখে, তখন সাধারণতঃ সেই বস্তুটি তার নিকটতম প্রতিবেশ থেকে বেছে নেয়—তার নিকটতম প্রতিবেশে তার মা-ই থাকেন বলে সে মা-কেই বেছে নেয়। শিশু তার মাকে নিবিড়ভাবে ভালবাসতে আরম্ভ করে এবং পরিবর্তে স্বার্থপরের ন্যায় মায়ের কাছ থেকেও অনুরূপ ভালবাসা পেতে চায়। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে তার মা অপর একজনের অধিকারে। এ সময়ে শিশুর বয়স খুব কম থাকলেও (কারণ ছ' বছর বয়সের মধ্যেই শিশুরা এ অবস্থা অতিক্রম করে) সে কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে যে মা বাবার অধিকারে আছেন। ফ্রয়েডের মতে মায়ের প্রতি শিশুর ভালবাসার মধ্যে প্রবল যৌন আকাঙ্ক্ষা আছে এবং মাকে পাওয়ার জন্ত পিতার প্রতি তার ভীষণ ঘৃণা হয় এবং যদি সম্ভব হত তাহলে পিতাকে মেরে ফেলতেও সে কুন্ঠিত হত না। শিশু তার পিতাকে তার

একজন প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে এবং পিতার সঙ্গে সেই অনুযায়ী আচরণ করে।

অনেকেই হয়ত রেগে একথা বলবেন যে তাঁরা কখনও পিতাকে মারতে বা মাতাকে বিবাহ করতে চিন্তা করেছেন এরূপ তাঁদের মনে পড়ে না। এ কথা তাঁদের আবার মনে করিয়ে দিতে চাই যে শিশুর এই সব ক্রিয়া-কলাপের স্মৃতি তার মনের নির্জ্ঞান স্তরে চলে যায়। যদি কোন স্মৃতি অবদমিত হয়, তা হলে তাকে স্মৃতিপথে ফিরিয়ে আনা খুবই কঠিন। তা সত্ত্বেও ইডিপস্ গূঢ়ৈষার কিছু না কিছু বিকাশ শিশুদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে কোন একজন রোগীর যখন সর্বকনিষ্ঠ সন্তানের জন্ম হয়, তখন তিনি বিদেশে ছিলেন। সন্তানের তিন বছর বয়স অবধি তিনি বাড়ী আসতে পারেন নি। তিনি যখন বাড়ী ফিরে এলেন তখন ছেলেটি তাঁর আগমনে সন্তুষ্ট না হয়ে স্পষ্টভাবে বিরুদ্ধভাব দেখাল এবং ছেলেটির মা তার পিতাকে ভালবাসা দেখাতে গেলে সে তাতে বাধা দিত।

অজাচারে (incest) সমাজে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আছে বলেই স্বভাবতঃ মনে হয় যে সকলের মধ্যেই অজাচার করার ইচ্ছা আছে। সামাজিক শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা তখনই অবলম্বন করা হয়, যখন কোন নিয়ম-বহির্ভূত কাজ করার জন্য জনসমাজের প্রবল ইচ্ছা থাকে। যদি অজাচার করার ইচ্ছা লোকের না-ই থাকত তাহলে এরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করবার কী হেতু থাকতে পারে?

ফ্রয়েডের মতে শিশু ভয় করে যে সে যে মাকে ভালবাসে এবং বাবাকে ঘৃণা করে, এর শাস্তিস্বরূপ বাবা তার উপস্থচ্ছেদ করতে পারেন। এটা সকলের কাছেই অসম্ভব বলে মনে হবে কিন্তু এ নিয়ে ফ্রয়েডের বিরুদ্ধে

কোন মন্তব্য প্রকাশ করতে হলে, সেটা ভেবে-চিন্তে করা উচিত। লেখকের একটি রোগী তার উপস্থচ্ছেদ করানোর জন্য বিদেশে এক অস্ত্র-চিকিৎসকের নিকট গিয়েছিলেন। রোগীটি মনে করতেন যে যৌন-অনুভূতি খুব একটা ঘৃণার বিষয়। এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যই তার উপস্থচ্ছেদের প্রবল বাসনা হয়েছিল। এই ব্যাপারটি সমীক্ষণ করার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। সমীক্ষণ করার পর হয়ত দেখা যেতে পারে যে রোগীটি উপস্থচ্ছেদ ভীতি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই নিজেই সে কাজ করে মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল—খুনী আসামী যেমন অনেক সময় আত্মহত্যা করে বসে। আমি এমন অনেক রোগী দেখেছি যাঁদের মধ্যে উপস্থচ্ছেদের প্রবল ভয় আছে—তাঁদের সর্বদাই আশঙ্কা থাকে যে তাঁদের উপস্থচ্ছেদন করা হবে। তাঁরা দন্তচিকিৎসককেও ভয় করেন—মনে করেন যে দন্তচিকিৎসকেরা আদৌ দাঁতের চিকিৎসা করেন না, দন্তচিকিৎসকদের সমস্ত আয়োজন উপস্থচ্ছেদের জন্য। উপরোক্ত এই সব দৃষ্টান্ত থেকে ভালভাবেই বোঝা যাবে যে ফ্রয়েডের সিদ্ধান্ত উড়িয়ে দেবার মত নয়। অসভ্য জাতির চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হলে দেখা যায় যে তাদের মধ্যেও এই ধরণের চিন্তা বিদ্যমান। ফ্রয়েড বিশ্বাস করেন যে শিশুরা মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ট হওয়ার সময়ে শ্বাস প্রশ্বাসের যে কষ্ট অনুভব করে তার থেকেই হয় উৎকণ্ঠার জন্ম। শিশুকে মাতৃস্তন হতে বঞ্চিত করার সময় এই উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে যায় এবং ইডিপস্—অবস্থায় উপস্থচ্ছেদ ভীতিতে এই উৎকণ্ঠা বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। উপরোক্ত প্রত্যেক অবস্থাগুলিতেই শিশুকে কিছু হারাতে হয় এবং এজন্য উপস্থচ্ছেদ এই অবস্থাগুলির প্রতীকে পরিণত হয়। যদিও উপস্থচ্ছেদ-গূঢ়ৈষার (castration complex) সত্যতা সম্বন্ধে কিছু বলা খুবই শক্ত, তবে এ জিনিষটা আমরা মেনে নিতে পারি যে শিশুরা যখন মাকে প্রবলভাবে ভালবাসতে সুরু করে তখন মাকে নিজের

মধ্যে অন্তঃক্ষেপ করে ; সুতরাং তারা মনের দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে মেয়েলি হয়ে ওঠে। মায়ের সঙ্গে নিজেকে একাত্মীকরণ করে বলে শিশুকে এখন সমকামী বলা চলতে পারে। মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে মায়ের সঙ্গে একাত্মীকরণই সমকামের প্রধান ভিত্তি, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যে সব ছেলেরা সম্পূর্ণরূপে মেয়েদের পরিবেশে মানুষ হয়েছে, অথবা যাদের পিতাদের মধ্যে পৌরুষের অভাব থাকে, তারা সাধারণতঃ মেয়েলি প্রকৃতির হয়—এটা হয়ত অনেকেই লক্ষ্য করেছেন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—এই ইডিপস্ অবস্থার দরুণ শিশুদের যে প্রক্ষোভ হয় তার কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে কিরূপে শিশুরা বেড়ে ওঠে? শিশুরা পিতা ও মাতা উভয়কেই ভালবেসে। পিতার প্রতি প্রতিকূলতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করে এবং ইডিপস্ গূঢ়ৈষার সঙ্গে মানিয়ে চলে। সে তখন পিতাকেও অন্তঃক্ষেপ করতে সক্ষম হয় এবং কাম-প্রবৃত্তি সমরতি থেকে ইতর-রতিতে পরিণত হয়। সাধারণ কথায় বলা চলে যে শিশু পিতার ছাঁচে নিজে গড়ে তোলে।

যে সব শিশু ইডিপস্ গূঢ়ৈষার প্রক্ষোভ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না, তাদের অবস্থা কেমন হয়? তাদের গতি কাম-বিকৃতির দিকে যায়। এই সব শিশু পরিণত বয়সে বুঝতে পারে যে প্রাপ্ত বয়সের কামধর্মের সুখ গ্রহণে তারা অক্ষম এবং পূর্বের অবস্থায় (শিশুকালে যে অবস্থায় তারা খুব সুখ পেত) ফিরে যায়। এটা শুনলে অসম্ভব বলে মনে হবে কিন্তু এ সম্বন্ধে ফ্রয়েডের তথ্যের সপক্ষে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

ফ্রয়েডের মতে কোন অবস্থাতে শিশু খুব বেশী আরাম বা খুব কম আরাম পাওয়ার দরুণই সেই অবস্থাতে তার 'সংবন্ধন' (fixation) বা

'প্রক্ষোভ অবরোধ' (emotional blockage) হয়। সুতরাং যে অবস্থায় সে সবচেয়ে বেশীআনন্দ পেয়েছিল সেই অবস্থায় সে পুনরায় ফিরে যেতে চায়। এই আনন্দ পাওয়ার জন্য যে দুর্দমনীয় ইচ্ছা, তাকেই ফ্রয়েড বলেছেন 'কামশক্তি' (libido)। যদি কোন শিশু 'মৌখিক' অবস্থায়, যেমন ধরুন স্তন্যপানের সময়, অত্যধিক আনন্দ পেয়ে থাকে তবে তার কামশক্তির কিছুটা অংশ সেই অবস্থাতেই (স্তন্যপান-কালীন অবস্থা) থেকে যায়। যদি কোন শিশু কোন অবস্থাতে খুব বেশী অথবা খুব কম পরিমাণ আনন্দ পেয়ে থাকে তবে সে কামশক্তির সঙ্গে সেই অবস্থাকে লাগিয়ে রাখে। তার মানে এই যে শিশু হয় তার এই প্রক্ষোভপূর্ণ অবস্থা ছাড়তে পারে না, (যেমন ধরুন তার যদি মাতৃসংবন্ধন থাকে তাহলে পরিণত বয়সেও সে সমকামীই থাকে) অথবা যদি এই প্রক্ষোভপূর্ণ অবস্থা ছাড়িয়ে যেতে পারে এবং তার স্বাভাবিক ক্রম বিকাশের পথে বাধা পায়, তবে সংবদ্ধ-অবস্থায় ফিরে আসার জন্য তার চেষ্টা থেকেই যায়। শিশুদের এই প্রক্ষোভপূর্ণ ক্রমবিকাশকে ফ্রয়েড সৈন্যদের কোন রাজ্য আক্রমণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সৈন্যেরা প্রথমতঃ বড় বড় সহরে ঘাঁটি স্থাপন করে এবং রাজধানী দখল না হওয়া পর্যন্ত অগ্রসর হতে থাকে। আর যদি পথে কোন বাধা পায়, তা হলে পুনরায় নিকটস্থ বড় ঘাঁটিতে পশ্চাদপসরণ করে। ঠিক এই প্রকারে আমাদের কামশক্তিও পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করে। উপরোক্ত তথ্যগুলি খুব কঠিনই মনে হয় কিন্তু যদি কোন উদাহরণ দিয়ে দেখান যায় তাহলে বোঝার পক্ষে খুব সুবিধা হবে। এই উদাহরণটি থেকে কামশক্তির প্রত্যাবর্তন পাঠকগণ খুব সরলভাবেই বুঝতে পারবেন। লেখকের নিকট একজন যুবক খুব ভীত হয়ে বলেছিল যে সে পুরুষের সঙ্গে প্রেমে পড়েছে। তার যৌন-জীবন পূর্বে স্বাভাবিক অর্থাৎ ইতররতি ছিল। কিন্তু মেয়েদের ভালবাসতে গিয়ে তাদের নিকট দুই দুইবার প্রতিঘাত

পাওয়ার পর থেকেই সে লোকের সাথে মেলামেশা বন্ধ করে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে আরম্ভ করল। এর পর তার একটি ছোকরা চাকরের প্রতি নজর পড়ল। তার জীবন নিঃসঙ্গ ছিল বলে সে এই চাকরটিকে খুব বেশী রকমের স্বাধীনতা দিতে লাগল এবং কোথাও যেতে আসতে সে এই চাকরটিকে সঙ্গে নিত। সে ভাবত যে মানব-প্রীতির ওপর ভিত্তি করেই সে চাকরের প্রতি এরূপ ব্যবহার করছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আবিষ্কার করে ফেলল যে সে চাকরটিকে ভালবেসে ফেলেছে। এখানে ব্যাপারটি কি হল দেখা যাক। যুবকটি স্বাভাবিক অর্থাৎ ইতররতিই ছিল এবং মেয়েদের কাছে দুই-দুইবার প্রতিঘাত পাওয়ার দরুণই সে সমকাম অবস্থায় ফিরে এল। এটা দেখা গিয়েছিল যে তার মায়ের সঙ্গে তার কামশক্তির সংবন্ধন ছিল। তাকে চিকিৎসা করে সারান হয়েছিল এবং সে ইতররতি অবস্থায় ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছিল।

ফ্রয়েড দেখেছিলেন যে স্নায়বিক অনেক অসুখেরই, বিভিন্ন অবস্থায় সংবন্ধনের সঙ্গে যোগ থাকে এবং যে রোগীর সংবন্ধন যত শৈশব অবস্থার দিকে তার চিকিৎসা করা তত কঠিন। হিস্টিরিয়া রোগীদের ইডিপস্‌-অবস্থায় সংবন্ধন থাকে এবং এই সব রোগীদের নির্জ্ঞান মনে সমকামলক্ষণ বিদ্যমান থাকে। একটি উদাহরণ দেখুন—একটি বালিকা নানান্‌ রকমের ব্যথা, ভীষণ মাথার যন্ত্রণা প্রভৃতির অনুযোগ করত এবং বলত যে এই যন্ত্রণার দরুণ তার কাজ-কর্মের খুব ব্যাঘাত হচ্ছে। মনঃসমীক্ষণ করার পর দেখা গেল যে পিতার সঙ্গে তাঁর খুব গভীরভাবে সংবন্ধন ছিল এবং পিতার ওপর এই প্রক্ষোভ যখন চলে গেল তখন তাঁর হিস্টিরিয়ার লক্ষণগুলিও দূর হয়ে গেল। অন্যান্য অবস্থার সহিত সংবন্ধনেরও উদাহরণ দেওয়া যায়। পায়ু-অবস্থার সঙ্গে সংবন্ধনের একটি সুন্দর উদাহরণ একজন রোগীর স্বপ্ন থেকে দেখা

যাক। রোগীটি স্বপ্ন দেখেছিল যে সে একটা মস্ত গুদামঘরে রয়েছে এবং সেখানে একটি লোক ময়দা মাখছে। লোকটা যেন তেতো-মদ (ale) তৈরী করবে। মদ তৈরী করে সে একটা পিপেতে ভরছে। পিপেটার তলায় মলমূত্র ছিল কিন্তু তা দেখে রোগীটির একটুও ঘৃণা হয়নি—মদকে আরও বেশী সুস্বাদু করতে হলে এটা যেন একান্ত দরকার। যে রোগীটি এই স্বপ্ন দেখেছিল তাকে বিশ্লেষণ করার পর জানা গেল যে সমকাম অবস্থার সহিত তার সংবন্ধন ছিল—যখন সে পীড়িত হয়েছিল তখন তার মনে হত সে একজন অন্তঃসত্ত্বা নারী এবং তার গর্ভে একটি পুত্রসন্তান আছে। যে সমস্ত রোগীর মৌখিক অবস্থাতে সংবন্ধন থাকে তাদের (লেখকের দ্বারা চিকিৎসিত একটি রোগীর ন্যায়) কোনও জন্তুর স্তনের বোঁটা চুষলেই কামোত্তেজনা হয়। লেখক আর একটি রোগীর চিকিৎসা করেছিলেন যিনি কোন শিশুর চুষিকাটি বা দুধ খাওয়ার বোতল চুষে আনন্দ পেতেন। এইসব রোগীর যে প্রক্ষোভের সংবন্ধন ছিল তাতে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু এর থেকেই প্রমাণিত হয়না যে সংবন্ধনই তাদের এই উদ্বায়ু রোগের কারণ। তবে এটুকু বলা চলতে পারে যে বেশীর ভাগ সময়েই প্রক্ষোভ সংবন্ধন থেকে উদ্বায়ু রোগের উৎপত্তি। ফ্রয়েডের এই তথ্যগুলি সকলে মানুক বা নাই মানুক, কিন্তু এটুকু ঠিক যে তাঁর এই তথ্যগুলির ভিত্তি বহুসংখ্যক ঘটনার ওপরে প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের এটা জানলে খুবই আনন্দ হয় যে ফ্রয়েড দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে দৈনিক আট দশ ঘণ্টা রোগীদের নির্জ্ঞান মন সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন। নিজের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন হয়ে তবে অন্যের তথ্যের সমালোচনা করা উচিত।

ফ্রয়েডের মত-অনুযায়ী মনের স্তর বিভাগ

	সংজ্ঞান মন							
	নির্জ্ঞান মন	+	+	+	+	+	+	
		+	+	+	+	+	+	
	ভাই-ভগিনী	—	+	—	+	—	+ —	
	পিতা	+	+	+	+	+		ইডিপস্
		+	+	+	+	+		ইডিপস্
		—	—	—	—	—		ইডিপস্
		—	—	—	—	—		ইডিপস্
	মাতা	+	+	+	+	+		ইডিপস্
		+	+	+	+	+		ইডিপস্
		—	+	—	+	—		
		—	+	—	+	—		
	উপস্থ	—	+	—	+	—		
		+	—	+	—	+		
	মূত্রনালী	—	+	—	+	—		
		+	—	+	—	+		
পায়ু	অবরোধ	+	—	+	—	+		
পায়ু		—	+	—	+	—		
পায়ু		—	+	—	+	—		
পায়ু	নিষ্কাষণ	—	+	—	+			
পায়ু		+	—	+	—			
পায়ু		—	+	—	+			
মৌখিক	কামড়ান	—	+	—	+			
মৌখিক		—	+	—	+			
মৌখিক	চোষণ	+	+	+	+			
	মাতৃগর্ভে থাকা কালীন অভিজ্ঞতা	?	?	?	?			ভালবাসা + ঘৃণা —

এখন আমরা মনের গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে ফ্রয়েডের ধারণা ও মতবাদ নিয়ে আলোচনা করতে পারি। একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা সিদ্ধান্তগুলিরই আলোচনা করব—ঘটনার বিষয়ীভূত বস্তু সম্বন্ধে নয়। ফ্রয়েডের অন্যান্য আবিষ্কারের মত তাঁর সিদ্ধান্তগুলিরও ভিত্তি নিজের অভিজ্ঞতার ওপর এবং সেগুলি তর্ক দ্বারা খণ্ডন করা খুবই কঠিন। ফ্রয়েড বিশ্বাস করেন যে শিশুর জীবনের প্রারম্ভে তার মনের সংজ্ঞান স্তর থাকে না। সাহজিক শক্তির (instinctual energy) সমষ্টি নিয়েই শিশুর জীবনের প্রথম সূচনা। এই শক্তিই কামশক্তিতে পরিণত হয়। শিশু যখন ক্রমে ক্রমে বাস্তব জগতের সংস্পর্শে আসে তখন হতেই তার স্মৃতিশক্তির উদ্ভব হয়—প্রক্ষোভপূর্ণ ভাবের উদয় হয় এবং শেষে সে অহম্‌কে পায়। অহমের কাজ সংজ্ঞানতা অর্থাৎ বাস্তবের পরখ করাই এর উদ্দেশ্য। অহমের বিকাশের পূর্বে শিশু সম্পূর্ণরূপে সুখ-অনুসন্ধানী থাকে। সুখদায়ক পন্থায় আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিই শিশুর একমাত্র উদ্দেশ্য এবং জন্মের অব্যবহিত পরে শিশু বাস্তবজগতকে বিচার করে দেখতে পারে না। ফ্রয়েডের একজন বিশিষ্ট সমর্থক বুদাপেস্তের চিকিৎসক স্যাণ্ডো ফেরেঞ্জি (Sando Ferenczi) শিশুর বাস্তবকে আবিষ্কার সম্বন্ধে বেশ চমৎকার গবেষণা করেছেন। ফেরেঞ্জি মনে করেন যে শিশু চারটি অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। প্রথমে শিশু মনে করে যে সে সর্বশক্তিমান্, কারণ তার ইচ্ছানুযায়ী সব অভাব আকাঙ্ক্ষাই পূরণ হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় শিশু দেখে যে তার অনেক ইচ্ছাই অনেক সময় পূরণ হয় না। সুতরাং তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কান্না বা হাত পা ছোড়া প্রভৃতি আকার-ইঙ্গিত করা প্রয়োজন মনে করে। তৃতীয় অবস্থায় শিশু ভাবে যে সমস্ত জিনিষই জীবন্ত—তাদের প্রাণ আছে। চতুর্থ বা শেষ অবস্থাতে শিশুর বাস্তব জগতের বাহ্যিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ উপলব্ধি হয়। এই সব অবস্থার প্রমাণ আমরা বিকৃত

মস্তিষ্ক লোকেদের চিন্তাধারার মধ্যে এবং যাদুবিদ্যায়, তুক্‌তাক্‌ প্রভৃতি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন লোকেদের মধ্যে পাই। সমস্ত যাদুবিদ্যাই এক ধরণের চিন্তা থেকে উদ্ভূত এবং মনের বিকাশের দ্বিতীয় স্তরের অবশিষ্টাংশ।

শিশু এখন নিজের পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং তার অহম্‌ই তাকে চালনা করে। অহমের ক্রমবিকাশ শিশুর পক্ষে খুব বড় রকমের সহায় কারণ বাস্তব জগতের সংস্পর্শে এসে শিশু তার নিজের ব্যবহার প্রয়োজন অনুসারে রূপান্তরিত করে এবং ভবিষ্যৎ যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়। হঠাৎ একদিনেই যে অহমের উৎপত্তি হয় এটা বললে ভুল করা হবে—খুব ধীরে ধীরে দুঃখ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে এবং বাহ্যজগতের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করেই অহম্‌ এগিয়ে চলে তার চরম বিকাশের পথে। অনেকেই মনে করতে পারেন যে আমরা অহম্‌ ও নির্জ্ঞান মন (অদস্‌—Id) সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছি অর্থাৎ মনের সম্পূর্ণ গঠন প্রণালী বর্ণনা করেছি কিন্তু তা নয়। অহম্‌ থেকে যে সব ভাবধারা বিষঙ্গ হয়ে যায়, অদস্‌ সে সমস্তই গ্রহণ করে। এর কার্যপ্রণালী আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখেছি। এ সব ছাড়া আরও অনেক জিনিষ অদসের মধ্যে থাকে। আমরা পূর্বে দেখেছি কিরূপে বিভিন্ন অবস্থায় শিশু পিতামাতাকে নিজের মধ্যে অন্তঃক্ষেপ করে। এই অন্তঃক্ষেপ থেকেই শিশুদের মধ্যে অধিশাস্তার (Super-ego) উদ্ভব হয়। এই অধিশাস্তার ওপর ভিত্তি করেই সত্যাসত্য সম্বন্ধে নির্জ্ঞান ধারণা জন্মে। অভিক্ষিপ্ত পিতামাতার চরিত্র অনুযায়ী অধিশাস্তা গঠনের প্রকারভেদ হয়। দৃঢ় এবং রুক্ষ পিতাকে অন্তঃক্ষেপ করলে শিশুর অধিশাস্তাও দৃঢ় এবং রুক্ষ হয়। অধিশাস্তা সম্বন্ধে অনেকেই সঠিক ধারণা করতে পারেন না এবং তাঁরা প্রশ্ন করেন যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অধিশাস্তার কী প্রয়োজন? অধিশাস্তা ছাড়া আমরা অন্য যে-সব তথ্য জেনেছি সেগুলি বোঝাই কি আমাদের

পক্ষে যথেষ্ট নয়? অধিশাস্তার তথ্য খুবই মূল্যবান্। স্বপ্নে যে-শক্তি প্রহরীর কাজ করে, যে-শক্তি সংজ্ঞান মনের বহু ইচ্ছাকে দমিত করে এবং যে-শক্তি কতকগুলি ইচ্ছাকে মনের সংজ্ঞান স্তরে প্রবেশ করতে বাধা দেয়, সেই শক্তি সম্বন্ধে ভালভাবে বুঝতে এখন আমরা সক্ষম হব। এই শক্তি কখনও আমাদের মনের সংজ্ঞান স্তরে থাকতে পারে না, সুতরাং তাকে অহমের গঠনের অংশীভূত করাও চলতে পারে না; কাজেই এই শক্তি নির্জ্ঞান মনের অন্তর্ভুক্ত। আমরা জানি যে আমাদের সংজ্ঞান মনের সত্যাসত্য সম্বন্ধে ধারণা পিতামাতার নিকট থেকেই পাই; কাজেই এটা বললে কেন ভুল হবে যে নির্জ্ঞান মনের সত্যাসত্য সম্বন্ধে ধারণা সেই একই উৎস (অর্থাৎ পিতামাতা) থেকেই উদ্ভূত? অধিশাস্তাকে নির্জ্ঞান বিবেক বলা চলতে পারে। এই অধিশাস্তার বিষয় বলবার সময়ে ফ্রয়েড বলেছিলেন যে মানুষ নিজেকে যতটা সুনীতিপরায়ণ মনে করে, আসলে সে তার চেয়ে অনেক বেশী সুনীতিপরায়ণ এবং নিজেকে যতটা দুর্নীতি-পরায়ণ ভাবে, প্রকৃত পক্ষে সে তার চেয়ে অনেক বেশী দুর্নীতি-পরায়ণ। মানসিক রোগের লক্ষণের উৎপত্তির বিষয় এখন আমরা ভালভাবে বুঝতে পারব। প্রথমতঃ মানসিক লক্ষণগুলির প্রকাশে অদস্ হতে প্রেরণা যদি অধিশাস্তার মনোমত হয় তা হলে এগুলি সংজ্ঞান মনে প্রবেশ করতে পারে এবং পরিতৃপ্তও হতে পারে। কিন্তু প্রত্যেকটি প্রেরণা এবং ইচ্ছা সংজ্ঞান মনে আসার পূর্বে অধিশাস্তা এগুলিকে ভাল ভাবে পরীক্ষা করে দেখে এবং অধিশাস্তার মতে এগুলি যদি সংজ্ঞান মনে প্রবেশের অনুপযোগী হয় তবে এগুলিকে সংজ্ঞান মনে প্রবেশ করতে দিতে যথাসাধ্য বাধা দেয়। এই সব ব্যাপারে হতভাগ্য অহমের করার কিছু নেই। অধিশাস্তা ও অদসের দ্বন্দ্বের ফলাফল অহম্‌কেই ভোগ করতে হয়, এবং তা মানসিক লক্ষণের মধ্য

দিয়ে ব্যক্ত হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা একটি যুবক কসাইয়ের কথা বলেছি। যুবকটি যে দোকানের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিল, সেই দোকানের পরিদর্শকের নিকট অপমানিত হওয়ার পর থেকে সে ছুরি দেখলে খুব ভয় পেত। এই দৃষ্টান্তটি পরীক্ষা করে দেখলে আমরা খুব ভাল ভাবেই বুঝতে পারব। যুবকটির অদসের খুবই ইচ্ছা হয়েছিল যে পরিদর্শককে ছুরি দিয়ে খুন করে কিন্তু তার এই ইচ্ছাকে তার অধিশাস্তা কিছুতেই সংজ্ঞান মনে প্রবেশ করতে দিতে চাইল না এবং ভবিষ্যতে যাতে এই ইচ্ছা যুবকটির সংজ্ঞান মনে কখনও না আসতে পারে সেজন্য ছুরির প্রতি তার একটা ভয় জন্মিয়ে দিল। এই লোকটিকে সমীক্ষণ করা হয়নি, মনঃসমীক্ষণ করলে আরও অনেক কিছু এর মধ্যে পাওয়া যেত। হয়ত যে পরিদর্শকের ওপর তার রাগ হয়েছিল, তিনি সম্ভবতঃ তার পিতারও প্রতীক হতে পারেন। এটা দেখা যাচ্ছে যে এই সব লক্ষণের প্রকাশে অহমের কোন ক্ষমতা নেই। গ্লোভার (Glover) বলেছেন যে অদসের তুলনায় অহম্ হাতীর কাছে শিশুর মত। অহম্ ভাবে যে সে অদসকে চালনা করে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে হাতী তার নিজের ইচ্ছানুযায়ীই চলে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে অধিশাস্তা একটি বড় রকমের সামাজিক শক্তি। অধিশাস্তা যদি খুব কঠোর হয় এবং অদসের ইচ্ছা পূরণে খুব প্রবল ভাবে বাধা দেয়, তবে অতি শোচনীয় লক্ষণ প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। যে সমস্ত পিতামাতা শিশুদের সব সময়েই "কোরো না" "কোরো না" বলেন তাঁরা প্রকৃত পক্ষে শিশুদের খুব কঠোর অধিশাস্তা গঠনে সাহায্য করছেন এবং ভবিষ্যতে শিশুদের মধ্যে স্নায়বিক ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশেও (যা এ সব ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী) সাহায্য করছেন। এখন প্রশ্ন করা যায় যে এরূপ ধরণের মানসিক গঠনের দরুণ উদ্বায়ুগ্রস্ত লক্ষণ প্রকাশকে প্রতিরোধ করতে হলে এবং উদ্বায়ু রোগের

লক্ষণ প্রকাশ পেলে তাকে কী ভাবে চিকিৎসা করা দরকার? এর উত্তর খুব সহজ। নির্জ্ঞান মনের গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করবার একমাত্র পন্থাই হচ্ছে নির্জ্ঞাত বিষয়গুলিকে সংজ্ঞান স্তরে আনা। যদি রোগী চিকিৎসার উপযোগী হয়, তবে সে চিকিৎসকের সঙ্গে তার পিতামাতার বিষয়ে অবাধ-ভাবানুষঙ্গ করে এবং শেষ পর্যন্ত যে সব স্মৃতিগুলি তার অধিশাস্তা গঠনের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী, সেগুলিকে সংজ্ঞান মনে আনে। এইরূপে তার মানসিক গঠনের রূপান্তর হয়। সংজ্ঞান মনেই কোন বিষয়ের রূপান্তর সম্ভব—নির্জ্ঞান মনে আছে শুধু পরিবর্তনহীন, সময়-জ্ঞান-হীন ও সুখান্বেষনী জগৎ এবং এখানে অধিশাস্তা প্রহরীরূপে পাহারা দিচ্ছে। অধিশাস্তাকে যদি দিনের আলোতে টেনে আনা যায়, তবে তাকে খুব দয়ালু এবং যুক্তিবান্ অভিভাবকরূপে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

অধিশাস্তার তথ্য দিয়ে অনেক জিনিষেরই ব্যখ্যা করা সম্ভব। কোন কোন উন্মাদ রোগ, যেগুলি ফ্রয়েডের মতে খুব শিশুকালে সংবন্ধনের জন্য দেখা দেয় এবং যাতে রোগী বহুমুখকামীতে (polymorphously perverse) পরিণত হয়, তাতে রোগী এমন অনেক কাজ করে যা সুস্থ লোকে ধারণাও করতে পারে না। অধিশাস্তা গঠনের পূর্বের কোন অবস্থাতে রোগীর সংবন্ধন হওয়ায় অথবা এরূপ অবস্থায় ফিরে আসার দরুণই এরূপ হয়। নির্জ্ঞান মনের কোন ইচ্ছাকে সংজ্ঞান মনে আসতে প্রতিরোধ করার জন্য কোনও অভিভাবক নেই। সুতরাং এই সব রোগীর মলমূত্র ঘাঁটতে, আনন্দের জন্য অন্যকে আঘাত করতে, নির্লজ্জের মত উলঙ্গ হয়ে বেড়াতে এবং শিশুদের মত আচার-ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয় না। এ সব কাজকে প্রতিরোধ করবার জন্য কোন অধিশাস্তা না থাকায় এরূপ ঘটে থাকে।

উন্মাদ রোগীদের চাঙ্গা হয়ে ওঠবার জন্য অনেক সময় বহু উপদেশ

দেওয়া হয় কিন্তু তাতে কোন ফলই হয় না। রোগের উপসর্গের কারণগুলি রোগীর আয়ত্তের বাইরে থাকায় রোগী চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে না। তা ছাড়া উদ্বায়ু রোগী যতই তার লক্ষণগুলি সংজ্ঞান ভাবে দমন করতে চেষ্টা করে, ততই তার নিৰ্জ্ঞান মনের দ্বন্দ্ব বেশী হয় এবং লক্ষণগুলি আরও প্রকট হয়ে প্রকাশ পায়।

অধিশাস্তা অদসের ইচ্ছা ও অবদমিত প্রক্ষোভ চরিতার্থের ক্রিয়া-কলাপকে প্রতিরোধ করতে যদি না পারে, তবে রোগীর মধ্যে দারুণ দোষী-মনোভাব সৃষ্টি করে এবং কখনও কখনও আত্ম-দণ্ডের জন্য কোন কাজ করতে বাধ্য করিয়ে অধিশাস্তা এর প্রতিশোধ নেয়। যে রোগীটি স্ব-ইচ্ছায় নিজের উপস্থচ্ছেদ করতে চেয়েছিল, অধিশাস্তার তাড়নায় তার যৌন-অপরাধ বোধ প্রকাশ পাওয়ার দরুণই সে এরূপ কাজ করতে গিয়েছিল। পূর্বে বর্ণিত যে মেয়েটি নানারূপ শারীরিক জ্বালা-যন্ত্রণায় ভুগছিল এবং পিতার সঙ্গে যার সংবন্ধন ছিল, তার যন্ত্রণার কারণ এই যে তার শৈশবের পিতৃ-সংবন্ধনের জন্য সে মনে করত যেন সে শৈশব অবস্থাতেই আছে এবং নিজের সন্তানদের নিজের ভাই-বোন বলেই মনে করত এবং এই কারণে তাদের যত্ন নিতে পারত না বলেই তার অধিশাস্তা শাস্তি দিত। এটা মনে করা যেতে পারে যে অপরাধীদের অধিশাস্তা ভাল ভাবে গঠিত হয় না কিন্তু সব সময়ে একথা বলা চলে না। এমন অনেক অপরাধী আছে যাদের মধ্যে এই দোষী-মনোভাব ভাল ভাবেই বিদ্যমান এবং এটা এতই প্রবল যে শাস্তি পাওয়ার জন্যই তারা অপরাধ করতে বাধ্য হয়। এটা শুনে অসম্ভব বলে মনে হবে কিন্তু খুন করবার পর খুনী নিজেই যখন অনেক সময় অপরাধ স্বীকার করে তখন এটুকু বিশ্বাস করা যেতে পারে যে এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা শাস্তি পেতে চান, সে শাস্তি যদি ফাঁসীও হয়, তাতে তাঁরা কুণ্ঠিত হন না। এমন অনেক

লোকও আছেন যাঁদের শাস্তি পাওয়ার একটা দারুণ ইচ্ছা থাকে। এর কারণ তাঁদের অধিশাস্তা তাঁদের ইচ্ছাকে কার্যের অনুরূপ মনে করে এবং কোন কাজ করার দরুণ যে শাস্তি পাওয়া উচিত ছিল সেই কাজ করার এই সামান্য ইচ্ছাকেই কঠোর শাস্তি দেয়।

ফ্রয়েড তাঁর সিদ্ধান্তগুলি সমর্থনের জন্য যে সব ঘটনার উল্লেখ করেছেন, আমরা এখন সেগুলির আলোচনা করব। মনঃসমীক্ষণের বিপক্ষবাদীরা মনে করেন যে রোগীদের সমীক্ষণ করার সময় ঘটনাগুলি বিকৃত হয়ে যায় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা হয় না। অসভ্য জাতিদের মধ্যে সমীক্ষণ করে এই ঘটনাগুলি আহরণ করা হয়েছে। যেমন বয়ঃপ্রাপ্তদের নিরীক্ষণ করেই আমরা নির্জ্ঞান মনের অধিকতর পরিচয় পাই, সেইরূপ সভ্য জাতিদের চেয়ে অসভ্য জাতিদের সমীক্ষণ করেই আমরা অপেক্ষাকৃত কম বিকৃত তথ্যসমূহ পেতে পারি। ইয়ুঙ্ যখন তাঁর আবিষ্কারগুলির জন্য আদিম জাতিসমূহের পুরান শাস্ত্রের সাহায্য নিয়েছেন তখন ফ্রয়েড আদিম জাতিদের ধর্ম ব্যাখ্যা করবার জন্য তাদের টোটেম (Totem) সম্বন্ধে আলোচনা করে কিছুই অন্যায় করেন নি। রিটেল্‌স্ (Writtels) মনে করেন যে ইয়ুঙ্ মনঃসমীক্ষণ ত্যাগ করে নিজের মনোমত আরেকটি মতবাদ গড়ে তোলার জন্যই ফ্রয়েড তার প্রতিশোধস্বরূপ টোটেম সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে সুরু করেন। আমাদের কিন্তু এ কথা বিশ্বাস হয় না, কারণ কেবল ইয়ুঙ্ই নন, য়্যাড্‌লারও (Adler) ফ্রয়েডের দলত্যাগ করেছিলেন। কাজেই ইয়ুঙের প্রতি যে ফ্রয়েডের অসন্তোষ ছিল, এ বললে ভুল করা হবে। ইডিপস্-গূঢ়ৈষার ওপর ফ্রয়েডের অতি মাত্রায় জোর দেওয়া অনেকেই পছন্দ করেন নি। যাঁরা ফ্রয়েডের বিরুদ্ধে লিখেছেন তাঁদের প্রায় সকলেই এই ইডিপস্ গূঢ়ৈষাকে আক্রমণ করেছেন। এই ইডিপস্ গূঢ়ৈষাই ফ্রয়েডের বিপক্ষবাদীদের মধ্যে খুব বেশী রকমের চাঞ্চল্যের সৃষ্টি

করেছে। ফ্রয়েড অবশ্য বলেছেন যে এই বিরুদ্ধবাদের কারণ এই যে বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে খুব বেশী পরিমাণে অবদমিত গূঢ়ৈষা আছে এবং এর দরুণই চাঞ্চল্য ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েছে। এখন হয়ত এ প্রশ্ন উঠতে পারে অসভ্য জাতিদের মধ্যে অজাচারের ব্যাখ্যা কী ভাবে করা যায়? পশু-জগতের মধ্যে যেমন অবাধ-মিলন সম্ভব সেইরূপ এই অসভ্য জাতিদের মধ্যেও এরূপ মিলন সম্ভব, না কোনও প্রকার বাধা আছে? আমরা পরে দেখব যে শেষের কথাটিই ঠিক।

অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে টোটেমই সমস্ত ধর্ম ও সামাজিক বিধির স্থান অধিকার করেছে। উপজাতিগুলি বিভিন্ন গোষ্ঠে বিভক্ত এবং প্রত্যেকে টোটেমের নামে নিজের নাম গ্রহণ করে। সাধারণতঃ কোনও জন্তু বা প্রাকৃতিক শক্তি, যেমন বাতাস বা কোনও গাছপালা তাদের টোটেম হয়। উপজাতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক লোকের নিজের টোটেম জন্তুকে ভক্ষণ করা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ; কারণ সেই জন্তুকে ভক্ষণ করা মানে নিজের পূর্ব-পুরুষকে ভক্ষণ করা।

বিবাহের ফলে যে সন্তান-সন্ততি হয় তারা প্রত্যেকেই একই টোটেমের নাম গ্রহণ করে। কোন কোন উপজাতির মধ্যে সন্তানের মায়ের টোটেম আর কোন কোন উপজাতির মধ্যে পিতার টোটেম গ্রহণ করাই বিধি। মনে করুন ফ্রয়েড যেমন দেখিয়েছেন যে ক্যাঙ্গারু টোটেমের অন্তর্ভুক্ত কোন লোক যদি এমু (Emu) টোটেমের কোন মেয়েকে বিবাহ করে, তাহলে তাদের ছেলেমেয়ে সকলেই এমু-কে টোটেম বলে মানে। যদি কোন লোকের মা অথবা বোন তার মতই এমু টোটেমের অন্তর্গত হয় তবে তার পক্ষে সেই মা-বোনের সঙ্গে অজাচার-সম্বন্ধ টোটেম-আইন অনুসারে নিষিদ্ধ।

উপরোক্ত ঘটনাগুলি সত্যই প্রণিধানযোগ্য এবং ফ্রয়েডের মত অনুযায়ী

প্রত্যেকের মধ্যে অজাচার করার যে প্রবল নির্জ্ঞান ইচ্ছা আছে, এগুলি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এর চেয়েও আরও কৌতূহলোদ্দীপক রীতি-নীতি অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন ধরুন মেলানেশিয়া (Melanesia) দেশের ভাই-বোনদের মধ্যে সম্বন্ধ—ভাই ও বোন বয়ঃসন্ধিকাল উত্তীর্ণ হলে একে অন্যকে এড়িয়ে চলে এবং ছেলে বিবাহ যোগ্য হলে সে মাকে এড়িয়ে চলে। কোন কোন জাতের মধ্যে শাশুড়ী-জামাইয়ের মধ্যেও এরূপ এড়িয়ে চলার প্রথার প্রচলন আছে। ফ্রয়েড মনে করেন এই শেষোক্ত দৃষ্টান্তের কারণ এই যে, জামাই তার শাশুড়ীকে তার মায়ের অনুকল্প মনে ক'রে নিজের স্ত্রীকে বোন বলে ভাবতেও পারে। এর ফলে তার মনের মধ্যে দোষী-মনোভাব সৃষ্টি হয়ে তাদের বিবাহিত জীবনকে অসুখী করে তুলতে পারে। অপরপক্ষে শাশুড়ী তার মেয়ের সঙ্গে একাত্মাকরণ করে তার জামাইয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়তেও পারে। ফ্রয়েড মনে করেন সভ্যজাতিদের মধ্যে শাশুড়ীর সম্বন্ধে ঠাট্টা-তামাসা করার যে প্রচলন আছে, তার ভিত্তিও এই প্রক্ষোভের ওপর স্থাপিত। *

টাবু সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ফ্রয়েড বলেছেন—"নিষিদ্ধ কার্যের ওপরই টাবুর ভিত্তি স্থাপিত এবং এই কার্য করার জন্ম নির্জ্ঞান মনে খুব বেশী রকমের ঝোঁক থাকে।" টাবু সম্বন্ধে ঘটনাগুলি "উভয়-বল-বিশিষ্ট" (ambivalent); এতে গ্রহণ ও বর্জন করার উভয় ইচ্ছাই থাকে। অসভ্য জাতির লোকেরা তাদের শাসন কর্তাকে ঠিক এই রকম চোখেই দেখে। যেমন ফ্রয়েড বলেছেন—"এই সব অসভ্য জাতির রাজারা ঈশ্বরের মত প্রভূত পরিমাণে শক্তি ও প্রজাদের সুখে রাখার ক্ষমতার অধিকারী। সভ্যযুগের পরবর্তী অধ্যায়ে দাস-মনোভাবাপন্ন সভাসদেরাই

* ভারতবর্ষে অবশ্য এর চলন নেই।

তাদের রাজাদের যে সত্যই এই ধরণের ক্ষমতা আছে এ কথা ভক্তের মত প্রচার করত। বসুমতীকে ফল ফুলে সাজিয়ে দিয়েছে যে সূর্য কিরণ ও বৃষ্টির ধারা, তার জন্যই যে শুধু রাজাকে ধন্যবাদ দিতে হবে তা নয়—যে বাতাস জাহাজকে তীরে ভিড়িয়ে দেয় এবং ধরণীর বুকের ওপর দাঁড়াবার এই যে অধিকার আমরা পেয়েছি, তার জন্যও কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে রাজাকেই।”

প্রজাদের চোখে রাজার এই প্রচণ্ড শক্তিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য রাজাকে নানারূপ বিপদ-আপদের প্রতি সর্বদা সজাগ থাকতে হয় এবং রাজার ওপর এত বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় যে তাতে তাঁর জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ যেমন জাপানের মিকাডো (রাজা)-কে বাইরে বেড়াতে দেওয়া হত না, খোলা হাওয়ায় ও সূর্যের আলোতে বেরোনো তাঁর নিষেধ ছিল। দাড়ি কামানো এবং চুল ও নখ কাটাও বারণ ছিল। তাঁকে স্নান করতে দেওয়া হত না কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় কেউ স্নান করিয়ে দিলে তাতে বাধা ছিল না। রাজা যে পিতার প্রতীক একথা না জানলে মিকাডোর কাহিনী অহেতুক মনে হবে। যখন শিশুরা মনে করে যে তাদের পিতাদের নৈসর্গিক বা কমপক্ষে অলৌকিক শক্তি আছে তখন প্রজাদের পক্ষে রাজার ক্ষমতা সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা কিছুই আশ্চর্য নয়। কিন্তু মিকাডোর ওপর এত যত্ন নেওয়া হয় কেন? প্রকৃতির এই সমস্ত মূল্যবান্ জিনিষ, এমন কি সূর্যের আলো থেকেও কেন তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে? জাগ্রত অবস্থায় কেন তিনি স্নান করতে পারেন না? ফ্রয়েড মনে করেন যে নির্জ্ঞান মনে রাজার প্রতি প্রবল শত্রুতা থাকার দরুণই রাজার ওপর প্রজাদের এইসব বিধি নিষেধের আরোপ। এই ব্যাখ্যা সম্ভবতঃ সত্য, কারণ আমরা প্রায়ই দেখি যে অতিমাত্রায় যত্নের অন্তরালে রয়েছে নির্জ্ঞান শত্রুতা। “মহিলাটি খুব বেশী রকমের প্রতিবাদ করছেন”-শেক্সপীয়রের এই উক্তি প্রণিধান যোগ্য।

শিশুর সব ইচ্ছাই পূরণ হয়। সেইজন্য সে নিজেকে সর্ব্বশক্তিমান্ মনে করে একথা আমরা পূর্বে বলেছি, আপনাদের হয়ত মনে আছে। এই ধরণের মনোভাব আমরা রূপকথার মধ্যে পাই—রূপকথার গল্পে সমস্ত ইচ্ছাই খুব সহজে পূরণ হতে দেখা যায়। মাদুলী, কবজ এবং তুক্-তাক্ প্রভৃতির মূল্য আদিম জাতিদের জীবনে এতই প্রভাব বিস্তার করেছে যে তাদের চিন্তাধারা এইসব বিশ্বাসের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগীরা যেমন নিজেদের অসৎ ইচ্ছাগুলি বাইরের জগতের ওপর অভিক্ষেপ ক'রে মনে করে জগতের প্রত্যেকেই যেন তাদের যৌন-দোষ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হয়ে আছে, সেইরূপ ফ্রয়েড বিশ্বাস করেন যে ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতির ওপর বিশ্বাস, যা অসভ্য জাতিদের জগৎ জুড়ে রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি তাদের নিজেদের ধারণার অভিক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়। এটুকু ঠিক যে ভূত-প্রেত প্রভৃতি অপদেবতার অস্তিত্ব থাকলে এর উল্টো ভাল জিনিষের অস্তিত্বও থাকা উচিত কিন্তু অসভ্য জাতির জগতে এই ভূত-প্রেতের বাস্তবতা যেরূপ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, পরমাত্মার বাস্তবতা সেরূপভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়।

সুতরাং আমরা দেখি যে অসভ্যজাতিদের চিন্তাধারা অনেকটা উন্মাদ-রোগীর চিন্তাধারার মত। চার্লস্ ডারউইনের (Charles Darwin) একটি তথ্যের সঙ্গে ফ্রয়েড প্রায় সম্পূর্ণরূপে একমত এবং এই তথ্যটিকে পরিপূর্ণ করেছেনও ফ্রয়েড। বনমানুষদের নিয়ে গবেষণা করে ডারউইন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে খুব পুরাকালে মানুষ এখনকার যুগের বন-মানুষদের মত ছোট ছোট দলবদ্ধ হয়ে একত্র বাস করত। ফ্রয়েড বলেছেন, "চতুষ্পদ জন্তুরা (পুরুষ-জন্তু) অনেকে একত্রে দলবদ্ধ হয়ে সশস্ত্র অবস্থায় তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে—তাদের ঈর্ষাপরায়ণতা দেখে 'যথেচ্ছ-সঙ্গম' প্রকৃতি রাজ্যে কখনও চল ছিল বলে মনে হয় না।......মানব সমাজে

অধুনাচলিত আচার-ব্যবহার দেখে যদি আমরা সুদূর অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে এটাই নিশ্চিত বলে মনে হয় যে মানুষ প্রথমে ছোট ছোট দলে বাস করত—প্রত্যেকে একজন বা খুব শক্তিশালী হলে একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে বাস করত। এই এক বা একাধিক স্ত্রীকে সে ঈর্ষাপরায়ণভাবে অন্যের থেকে রক্ষা করত। তেমন সামাজিক না হলেও সে অন্ততঃ গরিলাদের মত একাধিক স্ত্রীকে নিয়ে বাস করত। গভীর বনের অধিবাসীদের কাছে শোনা যায় যে গরিলাদের প্রত্যেক দলে একটিমাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ থাকে; যখন বাচ্ছাদের মধ্যে কেউ (পুরুষ) বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন দলের ওপর প্রভুত্ব করার জন্য তার সঙ্গে তার দলপতির যুদ্ধ বাধে। তাদের মধ্যে যে অধিক শক্তিশালী সে অন্যকে বধ করে বা তাকে দল থেকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজে দলের ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করে। দল থেকে বিতাড়িত হয়ে সেই গরিলাটি চারিদিকে কিছুদিন ঘোরাফেরা করার পর অবশেষে একটী সঙ্গিনী জুটিয়ে নেয়। এইরূপ ঈর্ষার ফলে একই পরিবারের মধ্যে নিকট-সঙ্গম প্রতিরোধ হয়।

উপরোক্ত ঘটনাতে উদ্বায়ু রোগীর পিতাকে 'স্থানচ্যুত' করার ইচ্ছার সঙ্গে অসভ্য যুগের মানুষের ইচ্ছার মিল পাওয়া যায়। বনমানুষের ব্যবহারের সঙ্গে উদ্বায়ু রোগীদের ইচ্ছার যে নিকট সাদৃশ্য আছে, তা দেখে আশ্চর্য্যান্বিত না হয়ে পারা যায় না।

ফ্রয়েড এই তথ্যটিকে অভিনবরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে কোন টোটেমের অন্তর্গত লোকের সেই টোটেম জন্তুকে ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ। সচরাচর ক্ষেত্রে এই বিধিই প্রচলিত হলেও এমন সময়ও আসে যখন এই বিধি-নিষেধ পরিত্যাগ করে কোন টোটেমের অন্তর্গত লোকেরা মিলিত হয়ে একত্রে খুব উৎসব করে তাদের টোটেম জন্তুকে ভক্ষণ করে। আমরা আগেই দেখেছি টোটেম পিতার প্রতীক। এখন আমাদের

মনে এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে পরিবারের সকলে একত্র হয়ে পিতাকে বধ করে তাকে ভক্ষণ করার প্রথা কোথা থেকে এল? ফ্রয়েডের মতে এই প্রথার উদ্ভব খুবই আশ্চর্যজনক। তিনি বলেন যে দলচ্যুত হলে বিতাড়িত বানরেরা যেমন ঐক্যবদ্ধ হয় তেমনি ঈর্ষান্বিত পিতা যখন পুত্রদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেন তখন সমস্ত ভাইরাও সেইরূপ ঐক্যবদ্ধ হয়। ফ্রয়েড বলেন, "তারপর বিতাড়িত ভাইরা একদিন একত্রে সশস্ত্র হয়ে পিতাকে মেরে ফেলল এবং পিতার মাংস ভক্ষণ করল। এইরূপে তাদের পিতৃহত্যা সম্ভব হল। একা হলে যে কাজ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হত, ঐক্যবদ্ধ হয়ে তা করতে তাদের সাহস হল এবং তা করল……।" সত্যই এইসব পেটসর্বস্ব অসভ্য লোকেরা কাউকে হত্যা করলে তার দেহটা খেয়ে ফেলত। টোটেমকে বধ করে আনন্দে ভক্ষণ করাই মানবজাতির প্রথম উৎসব এবং এই অপরাধজনক কাজ থেকেই উৎপত্তি হয়েছে সমাজ গঠন, নৈতিক বাধানিষেধ ও ধর্ম। বস্তুতঃ এগুলি সবই অনুমানমূলক তথ্য। কিন্তু কী চমৎকারভাবে এইসব থেকে স্নায়ুরোগগ্রস্ত ও অসভ্যজাতির চিন্তাধারা সম্বন্ধে পরিচিত হওয়া যায়। ফ্রয়েড মনে করেন যে পূর্বযুগের এই পিতৃহত্যার কথা ভেবে পরে সন্তানেরা খুব অনুতপ্ত হয়েছিল এবং সেই অনুতাপই তাদের অজাচারে বাধা দিল কারণ অজাচারই তাদের পিতৃহত্যা করতে সক্ষম করেছিল। ভবিষ্যতে সন্তানেরা একাজ আর করতনা। খুন ও অজাচার করলে যে দোষ হয় তারও উৎপত্তি এই থেকে। ফ্রয়েড এটাও দেখেছেন যে মানুষের নিজের সম্বন্ধে তার যে ধারণা প্রকৃতপক্ষে সে তার চেয়ে অধিক সুনীতি ও দুর্নীতি পরায়ণ।

ফ্রয়েডের এই তথ্যগুলি দৈনন্দিন জীবনের ওপর আরোপ করার বিশেষ প্রয়োজন নেই। এই তথ্যগুলি ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারদিগকে আকৃষ্ট করেছে এবং তাঁরাই সাধারণ লোকদের শিক্ষিত করবার জন্য এইসব তথ্যের

ব্যবহার করছেন। ফ্রয়েডের তথ্যগুলিকে জনসাধারণ সকলেই প্রথমে যেরূপ অবহেলার চক্ষে দেখত এখন তাদের সে ভাব অনেকটা কেটে গেছে। এখন এগুলিকে শান্তভাবে গ্রহণ করে জীবনকে নতুনভাবে গঠিত ও চালিত করবার চেষ্টা চলেছে। আধুনিক জীবনযাত্রা প্রণালীর সহজ ও স্বাস্থ্যপূর্ণ উপায়, এর শিথিলতর নৈতিক নিয়মকানুন, রোদ হাওয়ার মধ্যে দেহকে উন্মুক্ত করে রাখবার আগ্রহ, কথাবার্তা ও আচার ব্যবহারের এই যে স্বাধীনতা এসবই ফ্রয়েডের শিক্ষার ফল, এ কথা বললে খুব বেশী বলা হবেনা। এটা আশা করা যায় যে ভিক্টোরিয়া যুগের জবড়জং পোষাক আষাকের মধ্যে আমরা আর আমাদের দেহকে আবদ্ধ করে রাখতে চাইনা। অথবা সেইযুগের চিন্তাধারার মধ্যে আমাদের চিন্তাশক্তিকে আবদ্ধ করে রাখবনা। ফ্রয়েড বলেছেন যে ভ্রান্ত কৃষ্টি থেকেই হয় অবদমনের উৎপত্তি এবং এ থেকেই স্নায়বিক ব্যাধিগুলি প্রকাশ পায়। আমরা এখন এমন একটা যুগের মধ্যে দিয়ে চলেছি যখন আমাদের জীবনধারাকে উন্নত করবার জন্য কৃষ্টিকে সংস্কার করে নতুনভাবে গড়বার চেষ্টা চলেছে। এবং এইরূপে উদ্বায়ুরোগকে রোধ করা, নিদেনপক্ষে কিছু পরিমাণে এর সংখ্যাধিক্য হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। যাঁরা Barrets of Wimple Street-এর সঙ্গে পরিচিত তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন এই উদ্বায়ুরোগ কীভাবে ভ্রান্ত কৃষ্টি থেকে উৎপন্ন হয়। এতে যে শুধু পিতামাতারই উদ্বায়ু লক্ষণ দেখা যায় তা নয়, সন্তানদের মধ্যেও এ রোগ সঞ্চারিত হতে বাধা পায় না। এটা বললে অন্যায় হয় না যে একজন উদ্বায়ুরোগী থেকে অনেক উদ্বায়ুরোগীর সৃষ্টি হতে পারে এবং পিতামাতার মধ্যে কেউ উদ্বায়ুগ্রস্ত হলে তাঁর পরিবারের সকলেই তাঁর দ্বারা কিরূপ প্রভাবান্বিত হয় এ দেখবার সুযোগ যাঁদের হয়েছে তাঁরা এ জিনিষটি ভালভাবে বুঝতে পারবেন। কাজেই, উদ্বায়ু এমন একটি বিশ্রী ব্যাধি যে পিতামাতার এ রোগ থাকলে তাঁরা এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেন যা

সন্তান-সন্ততিদের উদ্বায়ুরোগাক্রান্ত হবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। সন্তান সন্ততিরাও আবার ভবিষ্যতে অনুরূপ পরিবেশেরই সৃষ্টি করে, যেটা তাদের সন্তানদের রোগাক্রান্ত করে দেয় এবং এইরূপেই এ রোগ প্রবাহিত হয়। এই প্রবাহমান উদ্বায়ু-রোগকে রোধ করবার জন্য আমরা কী করতে পারি? তিনটি উপায়ে আমরা এই সমস্যা সমাধানের পথে অগ্রসর হতে পারি। প্রথমতঃ বলতে পারা যায় যে কৃষ্টিকে সংস্কার করে নূতনরূপে একে গড়ে তোলা (এটা আমরা একটু আগেই বলেছি), ভণ্ডামিকে দূর করে বেশ স্বাস্থ্যপূর্ণ উপায়ে জীবনযাপন করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ যে সব অবিবাহিতেরা বিবাহ করতে উৎসুক, তাদের যত শীঘ্র পারা যায় বিবাহ দেওয়া উচিত। কিন্তু যারা উদ্বায়ু রোগে ভুগছে, তাদের সন্তান-সন্ততি হওয়ার পূর্বে এই রোগ চিকিৎসা করে সারিয়ে দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। বিবাহের পূর্বেই যদি চিকিৎসা করে এ রোগ সারিয়ে দেওয়া যায়, তবে আরও ভাল হয়। এই যদি করা হয়, তা হলে তাদের বিবাহিত জীবন খুব সুখের ও শান্তিময় হয় এবং যে সব সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করে, তারাও বেশ স্বাস্থ্যবান্ হয়। তৃতীয় বা শেষ উপায়টি সবচেয়ে মূল্যবান্—। আমাদের দেখতে হবে শিক্ষকেরা যেন উদ্বায়ুগ্রস্ত না হন। (এই রোগে শিক্ষকেরা খুব বেশী আক্রান্ত হয়ে থাকেন।) শিশুদের শিক্ষার ওপর শিক্ষকদের খুবই নজর রাখতে হবে—শিশুরা যেন উদ্বায়ুগ্রস্ত না হয়, সে বিষয়ে তাঁদের খুবই লক্ষ্য রাখা উচিত। স্নায়বিক-দৌর্বল্যযুক্ত ছেলেদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, তা না করে গতানুগতিক ব্যবহার (যা এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে অনুচিত) করার দরুণ তাদের স্নায়বিক দুর্বলতা আরও বেড়ে যায়, এ প্রত্যেক মনোবিদই দেখেছেন। এটা বললে ভুল বলা হবেনা যে এই রোগ প্রকাশের জন্য পিতার পর শিক্ষকই সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেন। সঙ্কীর্ণ ও গোঁড়া 'ধর্ম'ভাবাপন্ন প্রতিবেশী

াগ প্রকাশে খুবই সাহায্য করে। যদি কেউ এমন পরিবেশে মানুষ হয় যেখানে সব কাজেই পাপপুণ্যের দোহাই দেওয়া আছে, তাহলে তার পক্ষে দোষী মনোভাব-সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব হবে না এবং এমন কি খুব কঠোর ব্যক্তিও হীনতাভাবপূর্ণ না হয়ে পারে না। নানারকম ভয় না দেখিয়ে, তাদের বিচার-বুদ্ধির কাছে আবেদন করে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার এই যে আধুনিক নিয়ম এটা সত্যি খুব বিজ্ঞান-সম্মত। সর্বোপরি যৌন-বোধকে শিশুরা যাতে স্বাভাবিক ও সুন্দর মনে করে এরূপ শিক্ষা তাদের দেওয়া উচিত। যে সব ছেলেরা যৌনবোধকে নোংরা ও পাপপূর্ণ বলে মনে করে তাদের ভবিষ্যতে খুব বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, কারণ তাদের প্রলোভের সঙ্গে শিক্ষার একটা দ্বন্দ্ব চলতে থাকে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যেসব আবিষ্কার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, তাদের সমালোচনা ও মূল্য-নিরূপণও আমরা করেছি। দুর্দমনীয় ফ্রয়েড, যিনি আশি বছর বয়স পর্যন্তও দৈনিক ৮।১০ ঘণ্টা করে মানসিক ও স্নায়বিক ব্যাধি সম্বন্ধে গবেষণা করতেন, তাঁর সম্বন্ধে যাই বলি না কেন, কিছুই অত্যুক্তি হবে না। আমরা তাঁর শত্রুই হই আর মিত্রই হই, তাঁর অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার ও কঠোর অধ্যবসায়ের আমরা প্রশংসা না করে পারি না। বিষয়ের তথ্য তখন সবেমাত্র আবিষ্কার হয়েছে এবং জ্ঞানের বয়সও তখন অপেক্ষাকৃত অল্প যখন ফ্রয়েডের আবির্ভাব হয়। তিনি তাঁর পূর্ববর্তীদের চেয়ে অ-নে-ক বেশী দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর অবাধ-ভাবানুষঙ্গের আবিষ্কার নির্জ্ঞান মনের দ্বার খুলে দিয়েছে। পূর্বে যে রোগীকে ঔষধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হত, সেই রোগীকে এখন অবাধ-ভাবানুষঙ্গের সাহায্যে চিকিৎসা করা আরম্ভ হল। ফ্রয়েড স্বপ্ন সম্বন্ধে বলেছেন যে স্বপ্নের বাহ্যিক রূপের মধ্যে অন্তর্নিহিত একটি প্রকৃত অর্থ আছে এবং রোগলক্ষণের সঙ্গে এর মিল আছে। এবং এর সঙ্গে "জাতীয় স্বপ্নের"—

যেমন পৌরানিক গল্প ও রূপকথা প্রভৃতিরও নিকট সম্বন্ধ আছে। রসিকতার ক্রিয়া কৌশল সম্বন্ধে অনেক তথ্য ফ্রয়েড আলোচনা করেছেন এবং স্বপ্নের গঠন-ভঙ্গীর সঙ্গে এর সম্বন্ধও উদ্‌ঘাটন করেছেন। তিনি আদিম জাতির ধর্ম সম্বন্ধে গবেষণা করে স্থির করেছেন যে উদ্বায়ু রোগের লক্ষণগুলির সঙ্গে এর নিকট-সম্বন্ধ আছে। তিনি মানুষের নির্জ্ঞান মন নিয়ে বিশদভাবে গবেষণা করে শৈশব থেকে বার্দ্ধক্য পর্যন্ত মানুষের প্রক্ষোভের গঠনরীতি আবিষ্কার করেছেন। তিনি মানুষের মনের স্তর বিভাগ করেছেন এবং এদের নামকরণও করেছেন। এই নামকরণের দ্বারা মানসিক রোগ চিকিৎসার খুব সুবিধা হয়েছে। মনঃসমীক্ষণকেই যদি আমরা মানসিক রোগের চিকিৎসার একমাত্র পন্থা মনে করি তবে এর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কিছুই বলবার আছে। প্রথমেই আমরা বলেছি যে মনঃসমীক্ষণ প্রথায় চিকিৎসাতেই উদ্বায়ুরোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হতে পারে। এতে খুব আশ্চর্য রকমের ফল পাওয়া যায়—যেন মানুষের নূতন ব্যক্তিত্বের উন্মেষ হয়। যখন এই চিকিৎসা সাফল্য লাভ করে তখন এটা হয় অতুলনীয়। সংবেশন প্রণালী ও অন্য প্রথায় উদ্বায়ুরোগের চিকিৎসায় শুধু রোগটা নিয়ে নাড়াচাড়াই করা হয় এবং সমীক্ষণ প্রথায় চিকিৎসার তুলনায় এই সব উপায়ে কোন বিশেষ সিদ্ধান্তেই পৌছান যায় না।

এবার অন্য দিকটা দেখা যাক—। সমীক্ষণ প্রণালীতে চিকিৎসায় সময়ও বেশী লাগে এবং এটা বিরক্তিকরও বটে। এ চিকিৎসায় মাসের পর মাস, এমন কি বছরের পর বছরও সময় লাগতে পারে। (অনেক সময় দু তিন মাস চিকিৎসার পর বাইরের থেকে বেশ ভাল ফল দেখা যেতে পারে কিন্তু তাকে সত্যিকারের ফ্রয়েডের সমীক্ষণ প্রণালী বলা চলে না।) এ চিকিৎসা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ কিন্তু যে পরিমাণ সময় সমীক্ষকদের এর জন্য ব্যয় করতে হয়, তার তুলনায় যে তাঁদের খুব বেশী পরিমাণে টাকা দেওয়া হয়, তা

মোটেই নয়। চিকিৎসকদের কাছে এ ব্যবসা যে খুব লাভজনক তাও নয় এবং বিশেষজ্ঞদের বেশী পরিমাণ অর্থ উপার্জন করা এই ব্যবসাতেই সবচেয়ে কঠিন। সত্যিই, একটি গরীব রোগীর পক্ষে চিকিৎসার জন্য এত সময় ব্যয় করা অত্যন্ত কঠিন এবং এমন কি খুব কম টাকায় অথবা বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করাবার সুযোগ থাকলেও তাদের দারিদ্র্যের জন্য চিকিৎসা করান কঠিন হয়ে ওঠে। মনঃসমীক্ষণের বিপক্ষে প্রায়ই এই আপত্তি তোলা হয় যে এতে রোগীর আদর্শ নষ্ট হয়ে যায়। এ কথাটাকে কিন্তু আমরা মেনে নিতে পারি না। আদর্শবাদের প্রকৃত যুক্তি ও মূল্য কতটুকু এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে অনেকেই এর জবাব দিতে পারবেন না। ঠিক ভাবে জীবন যাপন এবং প্রতিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলাই ত আদর্শবাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু উন্মাযুগ্রস্তেরা এইটাই করতে পারে না। তাই যদি হয়, তা হলে যত শীঘ্র তাদের আদর্শবাদ নষ্ট হয়ে যায় ততই ভাল। তা হলে তারা জীবনের উপযোগী করে নতুনভাবে আদর্শবাদ গড়ে নিতে পারে। এবং এর মূল্য তার কাছে অনেক বেশী। মানুষের যৌনজীবনের ওপর অধিক পরিমাণ জোর দেওয়ায় ফ্রয়েডের বিরুদ্ধে যে সব টিপ্পনী ও সমালোচনা করা হয় তার জবাব দেওয়ার কী প্রয়োজন? যৌন অনৈক্যই যদি উন্মাযু রোগের মূল কারণ হয়, তা হলে সেটাকে ভাল করতে আপত্তি কী? যদি কোন রোগীর মূত্রাশয়ে পাথরী হয় বা অর্শ রোগ হয়, তা হলে তাকে চিকিৎসা করাবার জন্য আমরা মোটেই দ্বিধা বোধ করি না, কারণ, আমরা দেখি সে খুবই যন্ত্রণা পাচ্ছে। মনোজগতে চিকিৎসার জন্য আমরা এই মনোভাব পোষণ না করি কেন?

মানসিক রোগ চিকিৎসার একটি শাখা, যেটা ফ্রয়েডের আবিষ্কারের একটি নতুন সংস্করণ এবং ফ্রয়েডের পূর্বে যেটাকে কোনদিন আলোচনা করা হয়নি—সেটা শিশুদের বিশ্লেষণ করা ও তাদের পরিচালনা করা।

সম্প্রতি এই বিষয়টির ওপর খুবই জোর দেওয়া হচ্ছে। পরিবেশ পরিবর্তনে এবং প্রক্ষোভজনিত কষ্টে শিশুদের একটু ভালভাবে নজর দিলে, তাদের যে পরিবর্তন দেখা যায় সেটা খুবই আশ্চর্যজনক। শিশুদের মধ্যে উন্মাদ রোগের সামান্য লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া মাত্রই যদি তাদের সুচিকিৎসা করা হয়, তা হলে এটুকু বলা যায় যে এই উন্মাদ রোগের সংখ্যা খুব বেশী পরিমাণে কমে যেত। যে সব বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং শিক্ষকদের মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আছে, সেখানেই এই সব চিকিৎসা বেশী পরিমাণে সম্ভব হয়। যে সব শিশুর তোৎলামি, মুদ্রাদোষ, রাত্রে ভয় পাওয়া, ঘুমন্ত অবস্থায় হেঁটে বেড়ান, দুষ্টুমি, চুরি করার অভ্যাস প্রভৃতি থাকে, তাদের যদি শৈশবে চিকিৎসা করা হয় তবে কয়েক সপ্তাহেই তাদের আরোগ্য করে দেওয়া যায় কিন্তু বেশী বয়সে চিকিৎসা করলে মাসের পর মাস, এমন কি কয়েক বছরও সময় লাগতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা শিশুদের মন বিশ্লেষণ করে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন, সেগুলি ফ্রয়েডের বয়ঃপ্রাপ্ত লোকদের বিশ্লেষণের সিদ্ধান্তগুলির সমর্থন করছে। আমেরিকায় এ সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সব কাজ হয়েছে, তা থেকে দেখান যায় যে উন্মাদের সংখ্যা কমান বা অন্ততঃপক্ষে রোগের আক্রমণ নিবারণ করা সম্ভব। উন্মাদ ব্যক্তিরা পাঠ্যাবস্থায় যে সব বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করত, আমেরিকার অনুসন্ধিৎসু মনোবিদেরা সেখানে খোঁজ-খবর নিয়ে দেখেছেন যে এই সব রোগীর পাঠ্যাবস্থাতেই উন্মাদের কিছু কিছু লক্ষণ যে বিদ্যমান ছিল, সে সম্বন্ধে শিক্ষকেরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। উন্মাদদের শতকরা পঞ্চাশজনের পাঠ্যাবস্থাতেই এমন সব অদ্ভুত আচার-ব্যবহার দেখা যায়, যা থেকে তারা যে অস্বাভাবিক এটা বোঝা উচিত। যদি উপযুক্ত সময়ে এইসব শিশুর চিকিৎসা করা হত, তা হলে তাদের উন্মাদ রোগ প্রতিরোধ করা যেত এবং তাদের মানসিক রোগকে অবাধে বেড়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হত

না। এই সব শিশুর অর্দ্ধ সংখ্যককেও যদি মানসিক রোগের আক্রমণ থেকে বাঁচান সম্ভব হত, তা হলে ইংলণ্ডের বছরে প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা খরচ বেঁচে যেত। ইংলণ্ডে শুধু মানসিক রোগের হাসপাতালগুলির জন্যই বছরে প্রায় দেড় কোটি টাকা খরচ হয়। শুধু অর্থের পরিমাণ ছাড়াও এতে মানবজাতির যন্ত্রণার পরিমাণও অনেক কমে যেত। মানসিক রোগের হাসপাতালে যে সব লোক কাজ করেছেন তাঁরাই এটা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।

পরিভাষা

অজাচার—Incest
অদস্—Id
অধিশাস্তা—Super-ego
অন্তঃক্ষেপ—Introjection
অবদমন—Repression
অবদমনকারী শক্তি—Repressive force
অবশিষ্টাংশ—Residue
অবাধ ভাবানুষঙ্গ—Free association
অব্যক্ত অংশ—Latent content
অভিক্ষেপ—Projection
অভিক্রান্তি—Displacement
অভিভাবন—Suggestion
অভিস্ফোট—Abreaction
অমূল প্রত্যক্ষ—Hallucinations
অস্মিতা—Personality
অহম্—Ego
ইডিপস্ গূঢ়ৈষা—Œdipus complex
ইতররতি—Hetero-sexual
উন্বায়ু—Neurosis
উন্বায়ুজনিত—Neurotic
উপস্থ—Genital
উভয়বল—Ambivalent
একাত্মীকরণ—Identification
কামস্থান—Erotogenic zones
কামশক্তি—Libido
কারণমূলক প্রক্ষোভ—Causal emotion
গূঢ়ৈষা—Complex
গৌন বিস্তার—Secondary elaboration
জাগরস্বপ্ন—Day dreams
টাবু—Taboo
টোটেম—Totem
নঙর্থক সংক্রমণ—Negative transference
নিদ্রাকারক অভিভাবন—Post-hypnotic suggestion
নির্জ্ঞান—Unconscious
পরিজ্ঞান—Insight
প্রক্ষোভ—Emotion
প্রক্ষোভ অবরোধ—Emotional blockage
প্রতিবন্ধ—Resistance
প্রতীক—Symbol

প্রতীক পরিণতি—Symbolization
পানিমেহন—Masturbation
পায়ু—Anus
বহুমুখকামী—Polymorphusly perverse
ব্যক্ত অংশ—Manifest content
বিকৃতি—Distortion
বিরেচন—Cathersis
বিষঙ্গ—Dissociated
বিষাদ বায়ু—Melancholia
মাতৃসংবন্ধন—Mother fixation
মৌখিক—Oral
যুক্ত্যাভ্যাস—Rationalisation
রসিকতা—Wit
রাগমোচন—Orgasm
রূপান্তরীকরণ—Transformation
শারীরতত্ত্ব—Physiology
শারীরস্থান—Anatomy
শ্লেষ্মা ঝিল্লী—Mucous membrane
সংক্রমণ—Transference
সংক্ষেপণ—Condensation
সংজ্ঞান—Conscious
সংবন্ধন—Fixation
সংবিষ্ট—Hypnotised
সংবেশন—Hypnosis
সদর্থক সংক্রমণ—Positive transference
সমকাম—Homo-sexuality
সমকামী—Homo-sexual
সাহজিক শক্তি—Instinctual energy
সম্পূরণ—Integration
স্থানান্তরীকরণ—Transposition
স্বতঃকামী—Auto-erotic
স্বপ্নক্রিয়া—Dream work
স্বপ্নচারিতা—Somnumbolism
স্বপ্ন প্রহরী—Dream censor
হিস্টিরিয়া—Hysteria
হীনতাভাব—Inferiority complex

২১নং পটুয়াটোলা লেনস্থ ক্লাসিক প্রেস হইতে শ্রীতেজেন্দ্রনাথ সরকার
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্র